অধ্যাপক শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

- এক ভয়াবহ অভিশাপ
- পরিত্রাণের উপায়

# সুদ : এক ভয়াবহ অভিশাপ
# পরিত্রাণের উপায়

অধ্যাপক
শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN 984-843-033-3

প্রথম প্রকাশ : মে-২০০৮
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে-২০১১
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩২
বৈশাখ ১৪১৮

প্রচ্ছদ : গোলাম মওলা

মুদ্রণ : আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র

**'Sud'** Written by Shah Habibur Rahman Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition May 2008 2nd Edition May 2011 Price Taka 35.00 only.

## সূচিপত্র

# সুদ : এক ভয়াবহ অভিশাপ : পরিত্রাণের উপায়

## ভূমিকা

সমাজ শোষণের যতগুলো উপায় এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়েছে, ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করার যত কৌশল প্রয়োগ হয়েছে সুদ সেগুলোর মধ্যে সেরা। কৌশল, পদ্ধতি, ফলাফল, অর্থনীতির চূড়ান্ত অনিষ্ট সাধন– সকল বিচারেই সুদের কাছাকাছি কোন সমাজ বিধ্বংসী হাতিয়ার নেই। তাওরাতের যে অংশটি বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট নামে পরিচিত তা থেকেই জানা যায় সুদের প্রচলন হয়েছিল আরও অতীতে। অর্থাৎ হযরত মূসার (আ) যুগের পূর্বেও সুদ বিদ্যমান ছিল। আজও সেই সুদ অপ্রতিহত গতিতে সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সুদকে সব সময়েই কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, সুদখোরদেরকে সামাজিক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সুদ বর্জনেরও আহ্বান জানানো হয়েছে যুগে যুগে। কোন আসমানী কিতাবেই সুদের লেনদেনকে সমর্থন করা হয়নি, বৈধতা দেওয়া হয়নি।

## সুদের সংজ্ঞা

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সুদকে সর্বৈব নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন– "এবং ব্যবসাকে হালাল করা হলো ও রিবাকে করা হলো হারাম"। (সূরা আল বাকারা : আয়াত ২৭৬)

কেন এই ঘোষণা? রিবা বা সুদকে কেন হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো? এজন্যে প্রথমেই জানা প্রয়োজন রিবা বা সুদ কি? রিবা কাকে বলে? আরবী রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে ইসলামে সব ধরনের বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধিকে হারাম বা নিষিদ্ধ গণ্য করা হয়েছে। প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক উমার চাপরার

মতে শারীয়াহতে রিবা বলতে ঐ অর্থকেই বোঝায় যা ঋণের শর্ত হিসেবে মেয়াদ শেষে ঋণগ্রহীতা অতি অবশ্যই মূল অর্থসহ ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য।

ইমাম ফখর আল-দ্বীন আল-রাজী বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আরববাসী সকলেরই রিবা সম্বন্ধে জানা ছিলো এবং তাদের মধ্যে এটি বহুল প্রচলিতও ছিলো। সে যুগেও তারা প্রথাসিদ্ধভাবে ঋণ দিতো এবং শর্ত অনুসারে তার উপর মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করতো, কিন্তু আসলের পরিমাণ থাকতো অপরিবর্তিত। যখন ঋণের মেয়াদ শেষ হতো এবং ঋণগ্রহীতা পরিশোধে ব্যর্থ হতো তখন সুদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে পরিশোধের সময়ও বাড়িয়ে দেওয়া হতো। (আত্‌তাফসীর আল কাবীর)

ইবনে হাজার আল আস্‌কালানী বলেন, পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হলো রিবা।

ইমাম আবু বকর আল জাসসাস আহকামুল কুরআনে বলেন, রিবা দু'রকম। একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে, অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই জাহিলিয়াত যুগের রিবা। তিনি আরও বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে ঋণ গ্রহণের সময়ে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি হতো। তাতে স্বীকার করে নেওয়া হতো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূলধনের উপর একটি নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্তসহ আসল মূলধন ঋণগ্রহীতাকে আদায় করতে হবে।

প্রখ্যাত তাফসীরবিদ ইবনে জারীর বলেন, "জাহিলিয়াত আমলে প্রচলিত ও আল-কুরআনে নিষিদ্ধ রিবা হলো কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা।" আরবরা তাই-ই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে পরিশোধের মেয়াদও বাড়িয়ে দেওয়া হতো। (তাফসীর ইবনে জারীর, ৩য় খণ্ড)

এখানে একটি ভুল বোঝাবুঝির নিরসন হওয়া প্রয়োজন। অনেকে আল-কুরআন ও সুন্নাহতে যে রিবার উল্লেখ রয়েছে তার অর্থ করেন ব্যক্তিগত

পর্যায়ে পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে দেওয়া ঋণের বিনিময়ে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ বা Usury। এদের মতে ব্যবসায়িক কাজে লগ্নিকৃত অর্থের জন্যে নির্দিষ্ট হারে প্রদেয় বাড়তি অর্থ বা Interest এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের মতে Usury বা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য হতে পারে। কারণ এতে শোষণ ও পীড়নের সুযোগ বা আলামত রয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ে লগ্নিকৃত অর্থ বা আজকের দিনের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক আদায়কৃত সুদ বা Interest নির্দোষ। কেননা এখানে কারো উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। বরং ব্যবসায়িক লেনদেনের মতোই উভয়ের সম্মতি ক্রমেই সুদের হার স্থিরীকৃত হচ্ছে। এই সুদও সরল সুদ এবং হারও যথেষ্ট নিচ, সাধারণত ৮%-১৮%। উপরন্তু এই ঋণে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, অর্থনীতির চাকা গতিশীল হয়। ফলে ঋণগ্রহীতার আয়ও বৃদ্ধি পায়। তার পক্ষে তাই "মূলধনের সময়ের প্রাপ্য" পরিশোধ করাই যুক্তিযুক্ত। তাদের দৃষ্টিতে এখানে কোন জবরদস্তি বা যুল্‌মের উপাদান বিদ্যমান নেই। বরং মুদ্রাস্ফীতির কারণে অর্থের যে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় সুদ গ্রহণের ফলে তা পূরণ হয়। ফলে মূলধন অবিকৃত থাকে।

তিনটি কারণে এই ব্যাখ্যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ সমগ্র আরব দেশে আরবী 'রিবা' শব্দের অর্থ সুদই করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর কোনও বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বা ভিন্ন কোন অর্থ প্রযুক্ত হয়নি। তাই সুদের ভিন্নতা বা প্রকার ভেদ বোঝার জন্যে ইংরেজী, বাংলা বা অন্য কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার করে অযৌক্তিক ধুম্রজাল সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। উদাহরণতঃ ইসলামে সুদ যেমন হারাম, মদও তেমনি হারাম। তাই একটা গ্লাসের পুরোটাই রঙিন মদে ভর্তি ও আরেকটা গ্লাসের তলায় ভুক্তাবশিষ্ট ও সাদা রঙের কিঞ্চিৎ মদের মধ্যে আসলেই প্রকৃতিগত বা বস্তুগত কোনও পার্থক্য নেই। পার্থক্য রঙের ও পরিমাণের। Interest ও Usury এর পার্থক্যও তাই মাত্রাগত, গুণগত নয়।

দ্বিতীয়তঃ আইয়ামে জাহিলিয়াতের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে রীতিমতো পুঁজি

লগ্নি করা হতো এবং সেজন্য সুদ আদায় করা হতো। সে সময়ে অনেকেই আজকের মতো ফার্ম খুলে এজেন্ট নিয়োগ করে সুদে পুঁজি খাটাতেন। এদের মধ্যে রাসূলের (সা) চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও বনু মুগীরার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। তাদের আদায়কৃত সুদকে আরবীতে রিবাই বলা হতো। রাসূল (সা) তাঁর চাচার সুদী কারবার বন্ধ করে দেন এবং খাতকের কাছে প্রাপ্য বকেয়া সুদ রহিত করে দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ, হা/১৯০৫)

তৃতীয়তঃ যারা "মূলধনের সময়ের প্রাপ্য" পরিশোধ করতে বলেন তাদের আচরণ গল্পের সেই একচোখা হরিণের মতোই। মূলধনের সময়ের প্রাপ্য যদি ঋণপ্রদানকারীর ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয় তাহলে ঋণগ্রহণকারীর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে না কেন? তার তো বরং সময়, মেধা ও শ্রম সবই এই একই সময়ে ঐ অর্থের পেছনে খাটছে। এছাড়া যারা বলেন অর্থের ক্রয়ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সুদ নেওয়া প্রয়োজন তারা ভুলে যান যে শুধুমাত্র সুদ আদায় করেই অর্থের ক্রয়ক্ষমতা স্থির রাখা যায় না। এজন্যে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অবলম্বন করা সমান জরুরী। তাই যারা Interest ও Usury-কে দুটো ভিন্ন বিষয় হিসেবে দেখতে চান তারা আসলে বিশেষ মতলব হাসিলের উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেন।

এ বিষয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের অধিকাংশেরই মধ্যে কিন্তু মতদ্বৈততা নেই। বিশেষতঃ রাসূলপূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে এবং আরবী ভাষায় যে অর্থে রিবার ব্যবহার হতো তা Interest ও Usury উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এ ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত্যে পৌছেছেন। [দ্রষ্টব্য : (i) T.B. Hughes. A Dictionary of Islam, Premier Book House. 1985. p. 544; (ii) Adam Kupar & Jessica Kupar, The Social Sciences Encylopaedia, Routledge & Kegan Paul, 1985, P. 405-406; (iii) Encylopaedia Judiace, Jerusalem, 1972, Vol. 16, p. 28; (iv) Raymond De Rover, International Encyclopaedia of the Social Sciences, London, Vol. 4, p. 434; (v) Henry, W. Spigel, A Dictionaray of Economics, Macmillan, 1987, Vol. IV, p. 769.]

বস্তুতঃ ইসলামে যে সুদ হারাম বলে গণ্য সে সুদ যত রকম নামেই পরিচিত হোক না কেন এবং তা প্রাপ্তির জন্যে যে পথ বা উপায়ই অবলম্বন করা হোক না কেন তা সবই হারাম। মনে রাখা দরকার, যে সময়ে রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছিল সে সময়ের আরব সমাজে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রদত্ত ঋণের উপর সুদ আদায় করা হতো তেমনি ব্যবসায়ে লগ্নিকৃত মূলধনের উপরও সুদ গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল। এই উভয় প্রকার সুদকেই তখন আরবী ভাষায় রিবা-ই বলা হতো এবং আল-কুরআনে এই রিবাকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

## সুদের বৈশিষ্ট্য

এই আলোচনা হতে সুদের চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হলো–

ক. সুদের উদ্ভব হয় ঋণের ক্ষেত্রে;

খ. ঋণ পরিশোধের সময়ে পূর্ব নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়;

গ. প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ ও গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্যে একটা সময়সীমা ঋণ গ্রহণের সময়েই নির্ধারিত হয়;

ঘ. ঋণগ্রহীতার কোন ক্ষয়-ক্ষতি, লাভ-লোকসান বা ঝুঁকি কোনভাবেই বিবেচনার বিষয় বলে গণ্য হয় না।

## সুদের প্রকারভেদ

ইসলামী শারীয়াহ অনুসারে রিবা দুই ধরনের– (ক) রিবা আল-নাসিয়া ও (খ) রিবা আল-ফদল।

(ক) রিবা আল-নাসিয়া হলো সময়ের বিনিময়। 'নাসিয়া' শব্দের মূল হলো নাসায়া যার আভিধানিক অর্থ হলো বিলম্ব বা প্রতীক্ষা। পারিভাষিক অর্থে ঋণের সেই মেয়াদ কালকে নাসায়া বলা হয় যা ঋণদাতা মূল ঋণের উপর নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে ঋণগ্রহীতাকে নির্ধারণ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ক- এক বছরের জন্যে, খ-কে টা: ১০০/- দিল এই শর্তে যে

সে তাকে টা: ১০০/- এর সাথে অতিরিক্ত আরও টা: ১০/- যোগ করে ফেরত দেবে। এই অতিরিক্ত টা: ১০/-ই হলো রিবা আল-নাসিয়া বা প্রতীক্ষার সুদ।

(খ) রিবা আল-ফদলের উদ্ভব হয় পণ্যসামগ্রী হাতে হাতে বিনিময়ের সময়ে। একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের সাথে বেশি পরিমাণ পণ্য হাতে হাতে বিনিময় করা হলে পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হয় রিবা আল-ফদল।

প্রখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, একদা বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সমীপে কিছু উন্নতমানের খেজুর নিয়ে হাজির হলেন। 'রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথা থেকে এ খেজুর আনলে? বিলাল (রা) উত্তর দিলেন, আমাদের খেজুর নিকৃষ্ট মানের ছিল। তাই আমি দ্বিগুণ পরিমাণ খারাপ খেজুরের পরিবর্তে এক গুণ ভাল খেজুর বদলিয়ে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ওহ! এতো নির্ভেজাল সুদ, এতো নির্ভেজাল সুদ। কখনো এরূপ করো না। তোমরা যদি উত্তম খেজুর পেতে চাও তাহলে নিজের খেজুর বাজারে বিক্রি করবে, তারপর ভাল খেজুর কিনে নেবে"। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হা/২৮১৪)

অন্য এক হাদীসে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) উল্লেখ করেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন– সোনার সাথে সোনা, রূপার সাথে রূপা, গমের সাথে গম, খেজুরের সাথে খেজুর, যবের সাথে যব, লবণের সাথে লবণ বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমান সমান এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে হাতে হাতে বিনিময় হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি বেশি দিয়েছে বা নিয়েছে সে সুদী কারবার করেছে। এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান।" (সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হা/২৮০৯)

তাই ইসলামে এই ধরনের লেনদেন তথা রিবা নিষিদ্ধ। এর অন্তর্নিহিত কারণ হলো তাৎক্ষণিক স্থানীয় লেনদেনের ক্ষেত্রেও উভয়ের পক্ষে সুবিচার ও যথাযথ বিনিময় সম্ভব নাও হতে পারে। তাই শারীয়াহর হুকুম হলো নির্ধারিত পণ্যটি প্রথমে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে হবে।

## সুদ ও মুনাফার পার্থক্য

অনেকে আছেন যারা সুদ ও মুনাফাকে একই মাপকাঠিতে বিচার করেন। এমনকি "সুদ তো মুনাফার মতোই" এতদূর পর্যন্তও বলতে কসুর করেন না। এজন্যেই এ দুয়ের পার্থক্য সংক্ষেপে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে নিচে তুলে ধরা হলো।

ক. সুদ হলো নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণদাতাকে মূল অর্থের সাথে প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ। পক্ষান্তরে মুনাফা হলো উৎপাদনের মূল্য ও উৎপাদন খরচের পার্থক্য।

খ. সুদ পূর্ব নির্ধারিত। অপরপক্ষে মুনাফা অর্জিত হয় পরে।

গ. সুদে কোন ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা নেই। অপরপক্ষে কোন উদ্যোগে বা কারবারে মুনাফা না হয়ে লোকসানও হতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী এবং উদ্যোক্তা উভয়ের ক্ষেত্রেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান।

ঘ. সুদ কখনই ঋণাত্মক হতে পারে না। বড় জোর খুবই কম বা তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হতে পারে। মুনাফা ধনাত্মক, শূন্য, এমনকি ঋণাত্মক (অর্থাৎ লোকসান) হতে পারে।

ঙ. সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে না। পক্ষান্তরে মুনাফা উদ্যোক্তা ও পুঁজির যোগানদাতার সময় ও শ্রম বিনিয়োগের ফল।

## খৃস্টধর্ম ও সুদ

আল-কুরআন নাযিলের পূর্বে অন্যান্য যেসব গ্রন্থ নাযিল হয়েছিলো সেসবেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, ঐসব গ্রন্থ আজ আর অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না। একমাত্র আল-কুরআনই এখনও পর্যন্ত রয়েছে অবিকৃত অবস্থায়, থাকবেও কিয়ামত পর্যন্ত। কারণ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন স্বয়ং এর হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। হযরত মূসা (আ)-এর উপর নাযিল হওয়া তাওরাত ও হযরত ঈসা (আ)-এর উপর নাযিল

হওয়া ইনজিল-এর যে বহু বিকৃতি ঘটানো হয়েছে যুগে যুগে একথা তো সর্বজনবিদিত। তারপরও ইনজিল শরীফ বা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট বা আদিপুস্তক তাওরাতেরই অংশবিশেষ বলে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ দাবী করেন। সেই আদি পুস্তকেই সুদ সম্বন্ধে যে ঘোষণা ও নির্দেশনা রয়েছে তা এ যুগের জন্যেও সমানভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণত–

১. "তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার স্বজাতীয় কোন দীন-দুঃখীকে টাকা ধার দাও তবে তার কাছে সুদগ্রাহীর ন্যায় হইও না; তোমরা তার উপর সুদ চাপাবে না।" [(Exodus) যাত্রাপুস্তক, ২২ : ২৬]

২. "তুমি তাহলে সুদ কিংবা বৃদ্ধি নেবে না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করবে... তুমি সুদের জন্যে তাকে টাকা দেবে না।" [(Leviticus) লেবীয় পুস্তক, ২৫ : ৩৬-৩৭]

৩. "তুমি সুদের জন্য, রৌপ্যের সুদ, খাদ্য সামগ্রীর সুদ, কোন দ্রব্যের সুদ পাবার জন্যে আপন ভ্রাতাকে ঋণ দেবে না।" [(Deuteronomy) দ্বিতীয় বিবরণ, ২৩ : ১৯]

৪. "যে সুদ ও বৃদ্ধি নিয়ে আপন ধন বাড়ায়... তার প্রার্থনাও ঘৃণাস্পদ।" [(Ecclesiastes) হিতোপদেশ, ২৮ : ৮-৯]

৫. "যে সুদের জন্যে টাকা ধার দেয় না... সে কখনও বিচলিত হবে না।" [(The Psalm) গীতসংহিতা, ১৫ : ৬]

৬. "পরন্তু কোন ব্যক্তি যদি ধার্মিক হয়... সুদের লোভে ঋণ দেয়নি, কিছু বৃদ্ধি নেয়নি... তবে সেই ব্যক্তি ধার্মিক, সে অবশ্য বাঁচবে।" [(Ezekiel) যিহিস্কেল, ১৮ : ৮-৯]

৭. "যদি সুদের লোভে ঋণ দিয়ে থাকে ও বৃদ্ধি নিয়ে থাকে তবে সে কি বাঁচবে? সে বাঁচবে না; সে এই সকল ঘৃণার্হ কার্য করেছে।" [(Ezekiel) যিহিস্কেল, ১৮ : ৯৩]

৮. "ঋণ দাও, বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করোও না।" [(Luke) লুক, ৬ : ৩৫)

এই সমস্ত নির্দেশ ও সদুপদেশের সরল অর্থ হলো সুদের লোভে ঋণ প্রদান জঘন্য অপরাধ; সুদখোরের প্রার্থনাও ঘৃণার বস্তু; সুদ না নিয়ে টাকা ধার দিলে সে ধার্মিক বলে গণ্য হবে। পরকালে তার শাস্তির ভয় থাকবে না। খৃস্টধর্মের শুরু হতে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা এবং রোমে পোপের নিয়ন্ত্রিত চার্চ হতে অন্যান্য চার্চের বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ ছিল। সকল চার্চই তখন এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করতো। মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চ অপরিসীম লোভ ও কৃপণতার জন্যে সুদখোরদের দেহপসারিণীদের সমতুল্য গণ্য করেছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রখ্যাত দার্শনিক ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণও সুদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তারা সুদের অশুভ পরিণতি তুলে ধরেছেন এবং সুদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন। এরিষ্টটল তাঁর Politics গ্রন্থে সুদকে কৃত্রিম মুনাফা আখ্যায়িত করে বলেছেন যে অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা এক ধরনের জালিয়াতি। সুতরাং, সুদের বৈধতা থাকতে পারে না। প্লেটো তাঁর Laws নামক গ্রন্থে সুদের নিন্দা করেছেন। থমাস একুইনাস সুদের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, অর্থ থেকে অর্থের ব্যবহারকে পৃথক করা যায় না। তাই অর্থের ব্যবহার করা মানে অর্থ খরচ করে ফেলা। এক্ষেত্রে একবার অর্থের ব্যবহারের মূল্য নেয়ার পর অর্থাৎ মুনাফা গ্রহণের পর পুনরায় অর্থের মূল্য নেওয়া হলে একই দ্রব্য দু'বার বিক্রি করার অপরাধ হবে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অবিচার। যারা সুদকে সময়ের মূল্য বলে দাবী করেন তাদের যুক্তি খণ্ডন করে তিনি বলেন, সময় এমন এক সাধারণ সম্পদ যার উপর ঋণগ্রহীতা, ঋণদাতা ও অন্যান্য সকলেরই সমান মালিকানা বা অধিকার রয়েছে। এ অবস্থায় শুধু ঋণদাতার সময়ের মূল্য দাবী করাকে তিনি অসাধু ব্যবসা বলে অভিহিত করেছেন।

## হিন্দুধর্ম ও সুদ

হিন্দুধর্মেও সুদকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনুর নাম আসে সকলের আগে। হিন্দুধর্ম শাস্ত্রকারগণের তালিকায় তাঁর নাম সবার শীর্ষে। তাঁর রচিত ধর্মসূত্রগুলো গ্রন্থাকারে মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা নামে লিখিত রূপ

পায় আনুমানিক ২০০ খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে। হিন্দুধর্মের পারিবারিক ও সামাজিক আচার-আচরণ, বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও রাজ ধর্ম বিষয়ে তাঁর গ্রন্থটিই ছিল সর্বপ্রথম এবং গুরুত্ব ও পরিচিতির বিচারে এখনও শীর্ষস্থানীয়। সুদ প্রসঙ্গে মনু বলেন–

"গোরক্ষকান্ বাণিজিকাংস্তথা কারুকুশীলবান।

প্রেষ্যান্ বার্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রাণ্ শুদ্রবদাচরেৎ ॥"

(মনু সংহিতা; অষ্টম অধ্যায়, শ্লোক নং ১০২)

অর্থাৎ, গোপালক, বণিক, পাচকাদি (কারু), নটকর্ম ও নৃত্যগীতাদিজীবি, দাসকর্মজীবি, কুসীদজীবি (সুদখোর) ব্রাহ্মণের প্রতি শুদ্রের ন্যায় ব্যবহার করবে। (সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনু সংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, কলিকাতা, ১৯৯৯)।

উপরের শ্লোক হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন ভারতে সুদ প্রথা চালু ছিল এবং সকল বর্ণের লোকেরাই তার সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ সুদ গ্রহণ করলে তার সাথে শুদ্রের মতো ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রম প্রথায় ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে উচ্চবর্ণের। এরপর যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা ব্যবসায়ী ও শুদ্র। শুদ্ররা অন্ত্যজ শ্রেণী বলে বিবেচিত হতো। সমাজে তাদের কোন সম্মানজনক ঠাঁই ছিল না। মনুর মতে সমাজের একদম উপরতলার লোকেরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা যদি সুদের লেনদেন করে তবে তাদের সাথে আচরণ করতে হবে একেবারে নিচতলার লোক শুদ্রদের মতোই। এর নিগূঢ় তাৎপর্য হলো সমাজের সম্মানিত শ্রেণীর লোকেরা সুদের মতো ঘৃণ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। যদি হয়েই বসে তাহলে তাদের মর্যাদা লোপ পাবে। তারাও সমাজের নিচতলার মানুষ বলে গণ্য হবে।

হিন্দুধর্মের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থ বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বলা হয়েছে–

"চিকিৎষস্য ভিক্ষোশ্চ তথা বার্ধুষিকস্য চ।

পাষণ্ডস্য চ নৈবান্নং ভুঞ্জীত নাস্তিকস্য চ।"

(উত্তর খণ্ড, শ্লোক নং ৬৩)

অর্থাৎ, চিকিৎসক, ভিক্ষুক, বার্ধুষিক (সুদখোর), পাষণ্ড ও নাস্তিকের অন্ন ভক্ষণ করবে না।

এখানেও দেখা যাচ্ছে সুদকে এতটাই ঘৃণা করা হয়েছে যে, সুদখোরের অন্ন ভক্ষণ করতেও শাস্ত্রে নিষেধ করা হচ্ছে।

## বিভিন্ন দর্শন ও সাহিত্যে সুদ

পুঁজিবাদের কঠোর সমালোচক এবং সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক প্রবক্তা কার্ল মার্কসও সুদ ও সুদখোরদের তীব্র ও তীক্ষ্ম সমালোচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য : Capital, Vol. 2)। তিনি অর্থনীতি হতে সুদ উচ্ছেদ, সুদখোরদের কঠোর শাস্তি প্রদান ও তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। অর্থ বা মুদ্রাকে তিনি সমাজ শোষণের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেছেন। এজন্যে সোভিয়েত রাশিয়ায় কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে যুদ্ধ সাম্যবাদ চলাকালীন সময়ে (১৯১৮-১৯২২) পুঁজিবাদী অর্থনীতি উৎখাতের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে রাশিয়ার মুদ্রা রুবল পর্যন্ত অর্থনৈতিক লেনদেন হতে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : E.H. Carr- The Bolshevik Revolution. Vol. 2, Ch. 17 Macmillan, 1952)।

পল মিলস ও জন প্রিসলে বলেন, ইতিহাসের কালপরিক্রমায় দেখা যায় অন্যের দুর্ভাগ্য হতে 'মুনাফা' অর্জনের জন্যে ইহূদী সুদখোরদের নিন্দা করা হয়েছে। প্লুটার্ক বিশ্বাস করতেন বিদেশী আক্রমণকারীদের চাইতে অর্থ ঋণদানকারীরা অধিক নির্যাতনকারী। সুদখোররা তাদের প্রবাদতুল্য অর্থ গৃধ্নুতা, নিষ্ঠুরতা ও অর্থলোলুপতার জন্যে বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনায় বিদ্রূপের খোরাক হয়ে রয়েছে। ইতালীর অমর কবি দান্তে তাঁর The Divine Commedy-তে সুদখোরদের নরকের অগ্নিবৃষ্টিময় সপ্তম বৃত্তে নিক্ষেপের কথা বলেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের অবিসংবাদী সম্রাট সেক্সপীয়ারের দি মার্চেন্ট অব ভেনিস নাটকের শাইলক ও মলিয়ের-এর দি মাইজার নাটকের হারপাগনের নাম কে না শুনেছে?

বাংলা সাহিত্যেও গল্প-উপন্যাসে সুদখোরদের শোষণ-পীড়নের মর্মন্তুদ

কাহিনীর উল্লেখ অপ্রতুল নয়। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা, শওকত ওসমানের ইতা, আবু ইসহাকের জোঁক প্রভৃতি গল্প এবং কাজী ইমদাদুল হকের আবদুল্লাহ, জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে, শহীদুল্লাহ কায়সারের সংসপ্তক, সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গহীন গাঙ, অদ্বৈত মল্ল বর্মনের তিতাস একটি নদীর নাম প্রভৃতি উপন্যাস তার সাক্ষ্য বহন করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে কিভাবে বাংলার মানুষ সুদখোরদের হাতে শোষিত-লাঞ্ছিত-নির্যাতিত ও অপমানিত হয়ে আসছে উপরে উল্লেখিত উপন্যাসগুলোতে সেই রূঢ় বাস্তবতাই ফুটে উঠেছে।

## ইসলাম ও সুদ

সুদ প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান কঠোর ও অনমনীয়। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বেই সূরা আল বাকারাতে আল্লাহর ঘোষণা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরাতেই আরও বলা হয়েছে–

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে অংশ বাকী আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন ফিরিয়ে নিতে পারবে। না তোমরা যুল্‌ম করবে, না তোমাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবে।" (২৭৮-২৭৯ আয়াত)

কিয়ামাতের দিন সুদখোরদের অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে ঐ সূরাতেই বলা হয়েছে–

"যারা সুদ খায় তারা কিয়ামাতে দণ্ডায়মান হবে যেভাবে দণ্ডায়মান হবে ঐ ব্যক্তি যার উপর শয়তান আসর করে। তাদের এ অবস্থার কারণ, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেওয়ারই মতো। (২৭৫ আয়াত)

সুদের লেনদেন ও সুদের সাথে সংশ্রব রাখা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লেখে এবং সুদের সাক্ষ্য দেয় তাদের উপর আল্লাহর লানত এবং এ অপরাধের ক্ষেত্রে সকলেই

সমান।" (সহীহ আল বুখারী, জামে আত্ তিরমিযী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত, হা/২৮০৭)

আল-কুরআনে বহু ধরনের গুনাহর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। সেসবের জন্যে কঠোর শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে যতো কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে অন্য কোন গুনাহর ব্যাপারে এমন নয়। এজন্যেই সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সুদ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম (সা) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ নাজরানের খৃস্টানদের সাথে তিনি যে সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখে পাঠান, "যদি তোমরা সুদী কারবার কর তাহলে তোমাদের সাথে চুক্তি ভেঙে যাবে এবং আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।" বনু মুগীরার সুদী লেনদেন সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ ছিল। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রাপ্য সমুদয় সুদ বাতিল করে দেন এবং মক্কায় তাঁর নিযুক্ত তহশীলদারদেরকে লিখে পাঠান, যদি তারা (বনু মুগীরা) সুদ গ্রহণ করা বন্ধ না করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ কর।

রিবার অবৈধতা আল-কুরআনের সাতটি আয়াত (সূরা আল-বাকারা : ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০; সূরা আলে ইমরান : ১৩০ এবং সূরা আররূম : ৩৯ আয়াত), চল্লিশটিরও বেশি হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। এখানে কয়েকটি হাদীস তুলে ধরা হলো–

১. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, "আল্লাহর নবী (সা) বলেছেন, "যে রাত্রে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আমি কিছু লোককে দেখলাম যাদের পেট ঘটের মতো এবং বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল তাদের পেটগুলো সাপে পরিপূর্ণ। আমি জিবরাইলকে (আ) জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? জিবরাইল আমাকে বললেন, এরা ঐ সকল লোক যারা রিবার চর্চা করতো।" (সুনান ইবনে মাজাহ; হা/২২৭৩ মুসনাদে আহমাদ)

২. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "রিবার গুনাহ সত্তর প্রকার, তার মধ্যে সবচেয়ে কম ভয়ংকরটি হলো একজন

লোক তার আপন মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমান।" (সুনান ইবনে মাজাহ; সুনান আল বাইহাকী)

৩. আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি এক দিরহাম রিবা জ্ঞাতসারে গ্রহণ করে তবে তা ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও অনেক কঠিন।" (মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত, হা/২৮২৫)

৪. আবু হুরাইরা (রা) আরও বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আল্লাহ চার প্রকার লোককে জান্নাতে যাবার অনুমতি দেবেন না : (১) যারা অভ্যাসগতভাবে মাতাল; (২) রিবা গ্রহণকারী; (৩) অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎকারী এবং (৪) মাতা-পিতার প্রতি অমনোযোগী।

৫. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "এমন এক সময় আসবে যখন তুমি সারা দুনিয়া খুঁজে একজন লোকও পাবে না যে রিবা ভোগ করেনি, যদি কেউ দাবীও করে যে সে রিবা ভোগ করেনি তবে রিবার বাষ্প তার নিকট পৌঁছবেই। অন্য বর্ণনায় "রিবার অংশ তার নিকট পৌঁছবেই।" (সুনান আবু দাউদ, মিশকাত)

৬. আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) বলেছেন, "যদি তুমি কোন লোককে ঋণ দাও এবং সে তোমাকে এক বেলা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে, তার বাড়িতে খাবে না, কারণ এটি রিবা। যদি সে তোমাকে ঋণ নেয়ার আগে খাওয়ার অন্য অনুরোধ করে, এ ক্ষেত্রে তুমি ইচ্ছা করলে খেতে পার"। তিনি পুনরায় বললেন : 'যদি তুমি কাউকে ঋণ দাও এবং সে তোমাকে তার সওয়ারীর উপর আরোহণ করতে অনুরোধ করে, ঐ অনুরোধ গ্রহণ করো না। কারণ এটি রিবা। যদি সে তোমাকে ঋণ নেওয়ার আগে সওয়ারীর উপর আরোহণ করতে বলে এ ক্ষেত্রে তুমি এটা করতে পার"। (সুনান আল বাইহাকী)

৭. আনাস ইবনে মালিক (রা) আরও বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা)

বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি কাউকে ধার প্রদান করে, সেই ধার গ্রহণকারীর নিকট নিকট হতে কোন উপহার গ্রহণ করা উচিত হবে না। (অর্থাৎ কোন উপহার গ্রহণ করা উচিত হবে না যতক্ষণ না ঋণী ব্যক্তি তার ঋণ শোধ করে, কিন্তু ঋণ শোধ করার পর ঋণদাতা সেটা গ্রহণ করতে পারে)।" (সহীহ আল বুখারী)

৮. আবু বুরদা ইবনে আবি মূসা (রা) বলেছেন : আমি মদীনায় এসে আবদুল্লাহ ইবনে সালামের (রা) সাথে দেখা করার পর তিনি বললেন, "তুমি (এখন) এমন দেশে বাস কর যেখানে রিবার প্রচলন অত্যধিক। সুতরাং, যদি কারও কাছে তোমার ঋণের পাওনা থাকে এবং (যার কাছে তুমি পাওনা) সে যদি তোমাকে এক বোঝা খড় অথবা কিছু যব অথবা এক আঁটি ঘাসও উপঢৌকন দিতে চায় তবে ঐগুলো গ্রহণ করো না, কারণ ঐগুলো রিবা"। (সহীহ আল বুখারী)

৯. ফাদালাহ্ ইবনে উবায়েদ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, "কোন কর্জ হতে কোন ফায়দা নিলে ঐ ফায়দা এক ধরনের রিবা।" (সুনান আল বাইহাকী)

১০. উসামা ইবনে যায়িদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আর সুদ তো হলো সময়ের বিনিময়ের ক্ষেত্রে।" (সহীহ আল বুখারী, সুনান ইবনে মাজাহ)

১১. আবু উমামাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করে এবং তার বিনিময়ে কোন উপহার গ্রহণ করে, সে যেন কোন এক বড় দরজা দ্বারা রিবাতে ঢুকে পড়ল।" (সুনান আবু দাঊদ, হা/৩৫৪১, মিশকাত, হা/৩৭৫৭, মুসনাদে আহমাদ)

১২. ইবনে মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যদি কেউ বেশি বেশি সুদের লেনদেন করে তবে তার পরিণতি লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সুনান ইবনে মাজাহ, সুনান আল বাইহাকী)

উপরে উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে সুদ সম্পর্কে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়

সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে। এসবের মধ্যে রয়েছে সুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারা, কত সামান্য বিষয় এমনকি আপাতঃদৃষ্টিতে ঋণদাতাকে সৌজন্য প্রদর্শনও সুদ বা রিবা বিবেচিত হতে পারে; সুদ কত প্রকারের হতে পারে, এক সময়ে সুদ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করবে এবং তা থেকে কারো রেহাই থাকবে না; সুদের গুনাহ (যা কবীরা গুনাহ) কত নিকৃষ্ট ধরনের হতে পারে ইত্যাদি। তাই সুদ প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা যেমন প্রয়োজন তেমনি সমাজ দেহ হতে সুদ উচ্ছেদ ও রহিত করার জন্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণও সমান প্রয়োজন।

বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু রাসূলে করীম (সা) তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেতে ভুলেননি। তাঁর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণেও তিনি যে প্রকৃতই রাহ্মাতুল্লিল 'আলামীন তার পরিচয় রেখে গেছেন। অবিস্মরণীয় সেই ভাষণে তিনি একটিমাত্র ঘোষণার মাধ্যমে শোষণের বিষদাঁত চিরতরে ভেঙে দিলেন। অবিচল কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, "জাহিলিয়াত যুগের সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো। সবার আগে আমাদের গোত্রের আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সব সুদ আমিই রহিত করে দিলাম।" তারীখে আত্ তাবারী; সীরাতে ইবনে হিশাম)

সেই ঘোষণার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফাত পরবর্তী যুগেও বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি এক বিশাল ভূখণ্ডে দীর্ঘ নয়শত বছর ইসলামী হুকুমাত বহাল থাকাকালীন কোথাও সুদ বিদ্যমান ছিল না। সুদের মাধ্যমে কোন লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য হয়নি। পরবর্তীতে মুসলিমদের ভোগবিলাস ও আত্মবিস্মৃতির সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তিসমূহ তাদের পরাভূত করে ধ্বংস করে দেয় তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ। বিপরীতে মুসলিম দেশ ও সমাজ কোন প্রতিরোধ তো গড়তে পারেইনি বরং ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ে যোজন যোজন পথ।

এই সময়েই ইউরোপে সংঘটিত শিল্প বিপ্লবের পথ ধরে নতুন আঙ্গিকে সুদ পুনরায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে বিশ্বের সকল দেশে, সর্বস্তরে। ব্যাংকিং

পদ্ধতির বিকাশ ঘটে শিল্প বিপ্লবের হাত ধরেই। ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমেই সমাজে সুদের সর্বনাশা শোষণ ও ধ্বংস আরও গভীর ব্যাপ্তি লাভ করে। একদিকে পুঁজি আবর্তিত হতে থাকে শুধু ধনীদের মধ্যেই যা আল-কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে সুদের কারণে আরও নতুন নতুন অর্থনৈতিক নির্যাতন ও শোষণ বিস্তৃতি লাভ করে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে যার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ আজ আর সহজসাধ্য নয়।

## সুদের কুফল

মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা হতে সুদের ছোট-বড় অন্ততঃ পঞ্চাশটি কুফলের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলোকে নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সেসবের পুনরুক্তি না ঘটিয়ে এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কুফলের প্রসঙ্গে না গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কুফলগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

## ক. নৈতিক ও সামাজিক কুফল

### ১। সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।

একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঋণগ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক তাকে সুদের অর্থ দিতেই হবে। এর ফলে বহু সময়ে ঋণ গ্রহীতাকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। পরিণামে সে আরও দরিদ্র হয়। সমাজে শ্রেণী বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পায়। বস্তুত সুদ গ্রহীতারা সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জন ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবন যাপন করে। উপরন্তু বিনাশ্রমে অর্থ লাভের ফলে সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এদের কোন অবদান থাকে না।

### ২। সুদ মানুষকে স্বার্থপর ও কৃপণ বানায়।

অর্থলিপ্সা, কার্পণ্য ও স্বার্থপরতা সুদখোরদের কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিনাশ্রমে উপার্জনের আকাঙ্খা ও অর্থলিপ্সা হতেই সুদ প্রথার জন্ম। সুদের

মাধ্যমে নিশ্চিত ও নির্ধারিত আয় প্রাপ্তির লোভ সুদখোরদের বিচার-বিবেচনা, আবেগ-অনুভূতি এমনকি বিবেককে পর্যন্ত নিঃসাড় করে দেয়। সুদখোরদের মধ্যে লোভ ও স্বার্থপরতা ক্রমে ক্রমে এতদূর প্রসার লাভ করে, তাদের আচার-আচরণের এতখানি পরিবর্তন ঘটে যে তারা হয়ে ওঠে সমাজের পরিহাসের পাত্র। তাদের প্রবাদতুল্য লোভ, পরের সম্পদ ও বিত্ত গ্রাসের প্রবণতা গল্প-কাহিনীরও খোরাক হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বেই সেসব উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। যারা সুদ দিতে সক্ষম তাদের জন্যে মহাজন ও সুদী ব্যাংকগুলো এগিয়ে আসে ঋণের পসরা নিয়ে। কিন্তু যারা সুদ দিতে অপারগ তাদের পক্ষে ঋণ পাওয়া তো দূরের কথা, অনেক সময়ে মৌখিক সহানুভূতিটুকু পাওয়াও হয়ে ওঠে না।

**৩। সুদ শ্রমবিমুখতা ও অলসতা সৃষ্টি করে।**

সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলে কোন পরিশ্রম ও ঝুঁকি ছাড়াই সুদের মাধ্যমে নির্ধারিত হারে অর্থ পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থা যোগ্যতাসম্পন্ন, প্রতিভাবান ও কর্মঠ লোককেও অকর্মণ্য ও অলস বানিয়ে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা স্থাপন অর্থাৎ উৎপাদনধর্মী কাজে যে চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের দরকার সুদভিত্তিক সঞ্চয়কারীরা তা আর করে না। বরং ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ হতে বিনাশ্রমে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হারে আয় পেয়ে তারা পরিতৃপ্ত থাকে। ধীরে ধীরে আলস্য তাদের গ্রাস করে। এভাবে সুদের কারণেই যাদের হাতে অঢেল বিত্ত রয়েছে তাদের শ্রম, মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার ফসল হতে সমাজ বঞ্চিত হয়। সৃষ্টি হয় শ্রমবিমখুতা ও অলসতা। এদেশের সাহিত্যে এর ভুরি ভুরি নজীর মিলবে। বাংলাদেশে বিদ্যমান সুদী ব্যবস্থায় কেউ ব্যাংকে দশ লাখ টাকা জমা রেখে কোন রকম শ্রম, ঝুঁকি বা দুশ্চিন্তা ছাড়াই ঘরে বসে প্রতি মাসে এগারো হাজার টাকা পেতে পারে।

**৪। সুদ স্বল্প লাভজনক সামাজিক প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে।**

সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, তা উৎপাদনমুখীই হোক আর সেবামূলকই

হোক, একই হারে মুনাফা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে মুনাফার হার সুদের হারের চেয়ে বেশি, কোথাও সমান, আবার কোথাও বা কম। সাধারণভাবে বিলাস সামগ্রী ও সমাজের জন্যে অকল্যাণকর খাতে উৎপাদন ও ব্যবসায়ে মুনাফার হার হয়ে থাকে সর্বোচ্চ। প্রসাধনী ও বিলাস সামগ্রী, সৌখিন দ্রব্য, মদ ও নেশার বস্তু ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পক্ষান্তরে সমাজের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় ও কল্যাণকর দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার ক্ষেত্রে মুনাফার হার প্রায়শঃই খুব কম হয়ে থাকে। এমনকি তা প্রদেয় সুদের হারের চেয়েও কম হতে পারে। ফলে সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে যেখানে মুনাফার হার সুদের হারের চেয়ে বেশি সেখানেই বিনিয়োগ হয় সর্বাধিক। অপর দিকে যেসব অত্যাবশ্যকীয় খাতে মুনাফার হার সুদের হারের সমান বা কম সেখানে কোনো বিনিয়োগকারী এগিয়ে আসতে আগ্রহী হয় না। কারণ গৃহীত ঋণের সুদ প্রদানের পর উদ্যোক্তার আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। পরিণামে সামাজিকভাবে কাম্য সেবা ও দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহে সংকোচন ঘটে অনিবার্যভাবেই। অথচ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এই খাতে বিনিয়োগ সবচেয়ে জরুরী। যদি অর্থনীতিতে সুদ না থাকতো তাহলে বিনিয়োগকারীরা (এবং মূলধনের যোগানদারেরাও) প্রাপ্তব্য মুনাফাতেই (তার হার যত কমই হোক না কেন) পুঁজি বিনিয়োগে দ্বিধা করতো না। ফলে সমাজের অপরিহার্য ও কল্যাণকর খাতের সম্প্রসারণ ও কর্মোদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হতো।

**৫। সুদ নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ।**

সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে নিশ্চিত আয়ের অর্থাৎ অবধারিতভাবে সুদ প্রাপ্তির লোভে অনৈতিক ও অনৈসলামী কাজে মূলধন বিনিয়োজিত হয়। উদাহরণস্বরূপ মদের ব্যবসা, ফটকাবাজারী, মজুতদারী, অনৈতিক ও কুরুচিপূর্ণ গান-বাজনা, সিনেমা, এমনকি পর্ণোগ্রাফির মতো বিষয়ে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। এসব কাজে যেহেতু মুনাফা অর্জিত হয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হারে সেহেতু প্রদেয় সুদ পরিশোধের পরও বিস্তর মুনাফা থেকে যায় উদ্যোক্তার হাতে। তাই তার পক্ষে চড়া হারেও সুদ

পরিশোধ করা আদৌ কঠিন নয়। এই পথ ধরে সমাজে অনৈতিক ও অসামাজিক কাজের প্রসার ঘটে সহজেই। পরিণামে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরীর সহজাত বোধ-বিশ্বাসে চিড় ধরে। ধীরে ধীরে তাদের ঈমানী চেতনার বিলুপ্তি ঘটতে শুরু করে। ক্রমেই মূল্যবোধের ক্ষয় হয় এবং প্রায় অলক্ষ্যেই সমাজে নৈতিক অধঃপতন গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে। সমাজের অবক্ষয় তথা ধ্বংস হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিরোধ্য। অথচ মুনাফার হার তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার কারণে সমাজ হিতকর ও কল্যাণধর্মী প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্যে পুঁজি সংগ্রহ করা বর্তমান সময়ে অতীব দুরূহ কাজ।

**৬। সুদ সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।**

সুদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা তাদের প্রদত্ত ঋণের বিনিময়ে হাজার হাজার লোকের কঠোর শ্রমের ফসলে অন্যায্য ভাগ বসায়। শুধু তাই নয়, অনুৎপাদনশীল কাজের জন্যে গৃহীত ঋণের বিপরীতে যেহেতু কোন বাড়তি আয়ের সুযোগ নেই সেহেতু এই ঋণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাদের সহায়-সম্পত্তির উপরেও চাপ পড়ে অনিবার্যভাবেই। এমনকি ঋণের দায়ে অনেকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হয়, পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ওঠে নিলামে। মানুষের আপদকালে দাবীকৃত বাড়তি এই অর্থ অর্থাৎ সুদ তাই স্বভাবতঃই ঋণ গ্রহীতাদের সংক্ষুব্ধ করে তোলে। মানুষ তাদেরকে বিপদের দিনে দাতা মনে করার পরিবর্তে রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারই মনে করে। এরা হয়ে ওঠে সমাজে ঘৃণার পাত্র।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকায়, বাইতুল মাল হতে সাহায্য বা করযে হাসানা পাওয়ার কোন সুযোগ না থাকায় সুদভিত্তিক ঋণ নিতে বাধ্য হয় সমস্যাগ্রস্ত অসহায় নারী-পুরুষ। উপরন্তু সুদখোররা গরীব ও অসহায় কৃষকদের জমি-জিরাত ঋণের দায়ে দখল করে, ফসলের সুদ খেয়ে খেয়ে ধীরে ধীরে ফুলে ফেঁপে ওঠে, হয়ে ওঠে বিপুল সম্পদের মালিক। কখনও কখনও এমনও দেখা যায়, গৃহস্থ চাষী, ক্ষুদে খামারের মালিক সুদখোর মহাজনের ঐ জমিতে বর্গাচাষ করতে বাধ্য হচ্ছে

একদিন যে জমির মালিক ছিল সে নিজেই। স্বভাবতঃই তখন তার মনে সৃষ্টি হয় বিদ্বেষ ও অসূয়ার যার পরিণাম ফল মোটেই শুভ নয়।

**৭। সুদের কারণেই দরিদ্র আরও দরিদ্র এবং ধনী আরো ধনী হয়।**

সুদের পরিণামে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য বেড়েই চলে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষ প্রয়োজনের সময়ে সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে, উপায়ান্তর না দেখে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সেই ঋণ উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল উভয় প্রকার কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনুৎপাদনশীল কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহারের ফলে তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাই লোপ পায়। পুঁজিবাদী সমাজে করযে হাসানার কোন সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদনী খাতে ঋণ তো দূরের কথা, উৎপাদনী খাতেও বিনা সুদে ঋণ মেলে না। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো তাকে সুদ শোধ করতে হয়। এর ফলে সে তার শেষ সম্বল যা থাকে তাই বিক্রি করে উত্তমর্ণের ঋণ শুধরে থাকে। এই বাড়তি অর্থ পেয়ে উত্তমর্ণ আরো ধনী হয়। অধমর্ণ হয় আরও দরিদ্র। বৃদ্ধি পেতে থাকে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য।

বাংলাদেশে এক শ্রেণীর ধনী যে আরও ধনী হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ সুদভিত্তিক ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ দানের নীতি ও কৌশল। যোগ্যতা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় জামানত দিতে না পারার কারণে সুদী ব্যাংকগুলো হতে ঋণ পায় না, অথচ বিত্তশালী ব্যবসায়ী বা শিল্প উদ্যোক্তারা সহজেই ঋণ পায়। ব্যাংক হাজার হাজার লোকের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু ঐ অর্থ ঋণ আকারে পায় মুষ্টিমেয় বিত্তশালীরাই। এ থেকে উপার্জিত বিপুল মুনাফা তাদের হাতেই রয়ে যায়। ফলে সঞ্চয়কারী হাজার হাজার লোক তাদের অর্থের প্রাপ্য উচিত আয় থেকে বঞ্চিত হয়। বিত্তশালী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহকে যে সুদ পরিশোধ করে তা জনগণের কাছ থেকে সেবা ও দ্রব্যের মূল্যের সাথেই তুলে নেয়। ফলে ব্যাংকের দায় পরিশোধ করেও তাদের মুনাফার কোন কমতি হয় না, কিন্তু অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয় সাধারণ জনগণের। পরিণামে ধনীরা আরও ধনী

হয়, গরীবরা হয় আরও গরীব। সমাজ হিতৈষীরা তাই যতই 'গরীবী হঠাও'। বলে চিৎকার করুক সমাজের মধ্যে সুদের মতো এই দৃঢ়মূল, সুকৌশলী ও সর্বব্যাপী শোষণ প্রক্রিয়া বহাল থাকা অবস্থায় দারিদ্র্য দূরীকরণের কোন প্রেসক্রিপশনই কার্যকর হবে না।

## খ. অর্থনৈতিক কুফল

### ৮। সুদের শোষণ সার্বিক, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক প্রকৃতির।

সুদভিত্তিক ব্যাংক ও বীমা ব্যবসার কারণে ছোট ছোট সঞ্চয় সমাবেশ ও সঞ্চালনের সুযোগে বিরাট পুঁজি গড়ে উঠছে। বীমা ও ব্যাংক ব্যবসায়ে নিযুক্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এই পুঁজি চড়া সুদে ঋণ দিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করছে। একই সাথে ঋণ দেবার ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের বাছ-বিচারের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক শ্রেণী বৈষম্য। অর্থাৎ, শ্রেণী বৈষম্য হ্রাস না পেয়ে আরও ব্যাপক, গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। উপরন্তু বাংলাদেশের সুদী ব্যাংকসমূহের অনেকগুলো তাদের প্রদত্ত সুদকে ক্ষেত্রবিশেষে 'মুনাফার' লেবাস পরিয়ে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টাও করছে। ফলে প্রতারিত হচ্ছে সরলপ্রাণ ধর্মভীরু মানুষ।

সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে শোষণ যে কত সার্বিক ও কৌশলপূর্ণ একটা উদাহরণের সাহায্যে তা তুলে ধরা হলো। ব্যাংকে আমানতকারীরা যে অর্থ সঞ্চিত রাখে তার পুরোটা ব্যাংক কখনই নিজের কাছে গচ্ছিত রাখে না। সাধারণতঃ ঐ অর্থের ৯০% ঋণ দিয়ে থাকে ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারী-উদ্যোক্তাদের। তারা এই অর্থের জন্যে ব্যাংককে যে সুদ দেয় তা আদায় করে নেয় জনগণের নিকট হতেই তাদের প্রদত্ত সেবা ও পণ্যসামগ্রীর মূল্যের সঙ্গেই। এদের মধ্যে ঐসব আমানতকারীরাও রয়েছে যারা ব্যাংকে অর্থ রেখেছে সুদের মাধ্যমে নিশ্চিত নিরাপদ আয়ের উদ্দেশ্যে। আদায়কৃত সুদ হতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ একটা ব্যাংক পরিচালনা ও শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ডের জন্যে রেখে বাকি অংশ আমানতকারীদের হিসেবে জমা করে দেয় তাদের প্রাপ্য সুদ বাবদ। এভাবেই ব্যাংক ও অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানগুলো মাছের তেলে মাছ ভেজে নেয়। অন্যদিকে প্রতারিত হয় আমানতকারীরা।

কিন্তু তারা কি কখনও তা তলিয়ে দেখার অবকাশ পায়? বরং বছর শেষে পাশ বই বা কম্পিউটারাইজড একাউন্ট শীটে যখন জমার বিপরীতে সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দেখে তখন তারা দৃশ্যতঃ পুলকিত বোধ করে। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা পরিষ্কারকরে তুলে ধরা যেতে পারে।

**উদাহরণ-১**

| লেনদেনের বিবরণ | সুদের হার |
|---|---|
| ক. আমানতকারী (= ভোক্তা) ব্যবসায়ী/ উৎপাদনকারীকে সুদ বাবদ মূল্যের আকারে প্রদান করে– | ১৬% |
| খ. আমানতকারী ব্যাংক হতে সুদ বাবদ পায়– | - ৮% |
| = (ক-খ) ব্যাংকে সঞ্চয়ের বিপরীতে আমানতকারীর নীট লোকসান দাঁড়ায়– | = ৮% |

বিদ্যমান সুদভিত্তিক ব্যাংকি পদ্ধতি ও আইন এবং সমষ্টি অর্থনীতির (Macroeconomics) কর্মকৌশলের প্রেক্ষিতে কোনভাবেই এই অদৃশ্য অথচ প্রকৃতই লোকসান তথা শোষণ প্রতিরোধের উপায় নেই। এর প্রতিবিধান রয়েছে একমাত্র ইসলামী বিনিয়োগ ও ব্যাংকিং পদ্ধতির কর্মকৌশলের মধ্যে।

**৯। সুদের কারণেই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।**

কৃষকেরা ফসল ফলাবার তাকিদেই নিজেরা খেতে না পেলেও ঋণ করে জমি চাষ করে থাকে। প্রয়োজনের সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়া এদের জন্যে দুরূহ। তাই গ্রামেরই সচ্ছল লোকের দ্বারস্থ হয় তারা। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে একদল লোক এদেরকে 'সাহায্য' করার জন্যে তৈরীই থাকে। গ্রামাঞ্চলে এসব সুদখোররা সাধাণতঃ মহাজন নামেই অধিক পরিচিত। এরা শুধু গ্রামাঞ্চলেই আছে এমন নয়, নগরে-বন্দরে, গঞ্জে-মোকামেও এরা পরিচিত মুখ। এদের অনেকে আবার দাদন ব্যবসায়ী হিসেবেও পরিচিত। এরা প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী, ক্ষুদে ব্যবসায়ী সকলকেই টাকা ধার দেয়, ধান যোগান দেয়। শর্ত থাকে ফসল উৎপাদনের মৌসুমের শুরুতে অথবা আষাঢ়-

শ্রাবণ মাসে নেওয়া ঋণের জন্যে ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিমাসে প্রতি হাজারে টাঃ ১০০/- হারে সুদ দিতে হবে। অথবা প্রতি মণ ধানের বদলে ঐ সময়ে দ্বিগুন ধান দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যুক্তি হলো, এরা টাকা বা ধান ঋণ দিয়ে ফসল উৎপাদনে সহায়তা করছে। সুতরাং, এই উপকার বা সহযোগিতার বিনিময়ে কিছু 'পারিতোষিক' তো প্রাপ্য হতেই পারে। উল্লেখ্য, জাহিলিয়াতের যুগে আরব ভূখণ্ডে এভাবে খেজুর লগ্নির প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। ফলে দেখা যায়, ফসল তোলার পর নগদ অর্থ বা ফসলে সুদসহ ঋণ পরিশোধের পর কৃষকের হাতে আর তেমন কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। তাকে আবার ঋণ করতে হয় সংসার চালাবার জন্যে। ঋণের এই অশুভ চক্র হতে সে বেরিয়ে আসতে পারে না। ক্রমেই তার ঋণের পরিমাণ বাড়ে। এক সময়ে জমি জিরাত ভিটেমাটি দখল করে নেয় জমিখেকো মহাজনরা।

কৃষকরা এই ঋণ শুধু যে গ্রামের মহাজনের কাছ থেকেই নেয় তা নয়। সরকারের কৃষি ব্যাংক থেকেও নেয়, নেয় অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকেও। যথোপযুক্ত বা আশানুরূপ ফসল হওয়া সব সময়েই অনিশ্চিত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো রয়েছেই। যদি ফসল আশানুরূপ না হয় বা আকস্মিক বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসল খুবই কম হয় বা মোটেই না হয় তবু কিন্তু কৃষককে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদসহ ঋণ শোধ করতে হয়। তখন হয় তাকে আবার নতুন ঋণের সন্ধানে বের হতে হয় অথবা জমি-জিরাত বেচে কিংবা বন্ধক রেখে সুদ আসলসহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। তা না হলে কি মহাজন, কি ব্যাংক সকলেই আদালতে নালিশ ঠুকে তার সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করিয়ে নেবে। নিলামে চড়াবে দেনার দায়ে। দেশের প্রচলিত আইনও সুদগ্রহীতাদের পক্ষেই।

প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে একটা উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। ধরা যাক, কোন ব্যাংক হতে আলু চাষের জন্যে কৃষক ১৬% সুদে টাঃ ১০,০০০/- ঋণ নিলো। এজন্যে তাকে বছর শেষে বাড়তি ১৬০০ পরিশোধ করতে হবে। তাই ঐ কৃষকের জমিতে অবশ্যই আরও বেশি আলু উৎপন্ন হওয়া দরকার।

আলুর দাম গড়ে টা: ৪০০/- মণ হলে বাড়তি চার মণ আলু উৎপাদন হওয়া চাই। মজা হলো, আলুর ফলন বেশি হলে তা সবারই ক্ষেতে হবে। ফলে দাম পড়ে যাবে। আলুর দাম যদি মণ প্রতি টা: ৪০০/- হতে টা: ৩৫০/- তে নেমে আসে তাহলে চাষীর মণ প্রতি টা: ৫০/- অর্থাৎ ঐ আলুতেই তার টা: ২০০/- ঘাটতি থেকে যাবে। মোট বিক্রিত আলুতে ঘাটতির পরিমাণ যে আরও বেশি হবে তা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু ঋণের পরিমাণ যত বেশি হবে ঘাটতির পরিমাণও তত বেশি হবে। বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র কী? ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের ২৭% ভূমিহীন ছিল। কিন্তু মাত্র ৩৭ বছরের মধ্যে এর চিত্র পাল্টে গেছে। ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি শুমারী হতে দেখা যায়, বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সংখ্যা মোট কৃষিনির্ভর পরিবারের ৬৮.৮% এ দাঁড়িয়েছে (সূত্র : স্ট্যাটিস্টিকাল পকেট বুক অব বাংলাদেশ ১৯৯৬, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস, পৃ. ১৭৯)

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ সৃষ্টির পর হতেই এদেশে কৃষি উন্নয়নে ব্যাংক কৃষকদের অব্যাহতভাবে ঋণ দেওয়া শুরু করে। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা প্রদান রহিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে তাঁর নির্দেশে দেওয়া একশ কোটি টাকার আই.আই.সি.পি. ঋণ দেওয়া হয় যার প্রায় সবটাই আজও অনাদায়ী রয়ে গেছে। এরপরও বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা মুতাবিক তখন পর্যন্ত কৃষকদের কাছে প্রাপ্য পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ করা হয়েছিল। এরপরেও কেন দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে? এর অন্যতম প্রধান কারণ সুদভিত্তিক ঋণ প্রদান বা গ্রহণ। শুধু এদেশেই নয়, যে সমস্ত দেশে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক কৌশলগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি অথবা মূল্য সহায়তা (price support) বা উপাদান ভর্তুকী (input subsidy) আকারে বিশেষ সরকারী সহায়তা দেওয়া হয়নি সেসব দেশে সুদনির্ভর লেনদেনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা ক্রমেই ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছে।

**১০। সুদের ফলে একচেটিয়া কারবারের প্রসার ঘটে।**

বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে শর্তে ও যে সময়ের জন্যে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পেতে পারে ছোট ব্যবসায়ীরা সেভাবে ঋণ পায় না। এজন্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও তারতম্য ঘটে। সে প্রতিযোগিতায় অসম সুবিধা ভোগের সুযোগ নিয়ে বড় কারবারী বা ব্যবসায়ী আরো বড় হয়। ছোট কারবারী বা ব্যবসায়ী টিকতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যায়। বৃহদায়তন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাই। এই জাতীয় শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুধু ব্যাংকই নয়, বিনিয়োগ কোম্পানী ও অনৈসলামী সরকারসমূহ যে বিশেষ সুবিধা ও ন্যূনতম সুদের হারে টাকা ঋণ দিয়ে থাকে, ছোট বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্যে আদৌ সে সুযোগ নেই। ফলে বড় শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতাহীন বাজারে একচেটিয়া কারবারের সমস্ত সুযোগ লাভ করে। পরিণামে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরো প্রকট হয়।

**১১। সুদের কারণে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই পুঁজি আবর্তিত হয়।**

সুদ আদায় ও প্রদানের সামর্থ্যের কারণেই বিত্তবান ঋণদাতা ও গ্রহীতাদের হাতেই পুঁজি আবর্তিত হতে ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগ কোম্পানী তথা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান এবং ধনিক শ্রেণীর মধ্যে একটা অদৃশ্য সেতুবন্ধন বা যোগসাজশ লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে, অবৈধভাবে বা অন্য কোন উপায়ে কেউ প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে পারলে সুদের বদৌলতেই সে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যেতে পারে। পক্ষান্তরে পর্যাপ্ত জামানত দিতে না পারার কারণে স্বল্পবিত্তদের এখানে কোন ঠাঁই নেই। ফলে বিত্তশালীরা একাধারে সমাজকে শোষণ করে এবং একচেটিয়া কারবারেরও প্রসার ঘটে। সমাজে সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক নানা বিপর্যয়। এজন্যেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল-কুরআনে বলেছেন– "সম্পদ যেন কেবলমাত্র (তোমাদের) ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়"। (সূরা আল হাশর : আয়াত ৭)

**১২। সুদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।**

সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী উৎপাদন খরচের উপর

পরিবহন খরচ, শুল্ক (যদি থাকে), অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে পণ্যসামগ্রীর বিক্রি মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের উপর উপর্যুপরি সুদ যোগ করে দেওয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চার বার পর্যন্ত, ক্ষেত্রবিশেষে তারও বেশিবার সুদ যুক্ত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের বস্ত্র শিল্পের কথাই ধরা যেতে পারে। এই শিল্পের প্রয়োজনে তুলা আমদানী করতে হয়। আমদানীকারকরা ব্যাংক হতে যে ঋণ নেয় বিদেশ থেকে তুলা আমদানীর জন্যে তার সুদ যুক্ত হয় ঐ তুলার বিক্রি মূল্যের উপর। এরপর সুতা তৈরীর মিল ব্যাংক হতে যে ঋণ নেয় তারও সুদ যুক্ত হয় ঐ তুলা থেকে তৈরী সুতার উপর। পুনরায় ঐ সুতা হতে কাপড় তৈরীর সময়ে বস্ত্রকল সংস্থা বা কোম্পানী যে ঋণ নেয় সেই সুদ যুক্ত হয় কাপড়ের উপর। এরপর কাপড়ের এজেন্ট বা ডিলার তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যাংক হতে যে ঋণ নেয় তারও সুদ যোগ করে দেয় ঐ কাপড়ের কারখানা মূল্যের উপর। এভাবে চারটি স্তর বা পর্যায়ে সুদের অর্থ যুক্ত হয়ে বাজারে কাপড় যখন খুচরা দোকানে আসে বা প্রকৃত ভোক্তা ক্রয় করে তখন সে আসল মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে থাকে।

একটা নমুনা হিসাবের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হলো। ধরা যাক, বিদেশ হতে তুলা আমদানীর জন্যে কোন ব্যবসায়ী ব্যাংক হতে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিলো। এরপর বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে তা থেকে তৈরী কাপড় বাজারে ভোক্তার কাছে পৌছানো পর্যন্ত সুদজনিত মূল্য বৃদ্ধির চিত্রটি কেমন দাঁড়াবে? সঠিক অবস্থা বোঝার জন্যে দুটো অনুমিতি (Assumption) এখানে ধরা হয়েছে : (ক) উৎপাদন, বিপণন, গুদামজাতকরণ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাংক হতে ঋণ নেওয়া হয়েছে, এবং (খ) সুদের হার সকল ক্ষেত্রেই ১৬%। এই উদাহরণে বিভিন্ন পর্যায়ের অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় (যেমন– জাহাজ ভাড়া, কুলি খরচ, বিদ্যুৎ/জ্বালানী ব্যয়, গুদাম ভাড়া, পরিবহন ব্যয়, শ্রমিকের বেতন/মজুরী, সরকারী কর/শুল্ক ইত্যাদি) হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি।

**উদাহরণ-২**

ক. আমদানীকারীর আমদানীকৃত তুলার ক্রয়মূল্য টাঃ ১,০০,০০০/- হলে তার বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাঃ ১,১৬,০০০/-;

খ. সুতা তৈরীর মিলের তুলার ক্রয়মূল্য টাঃ ১,১৬,০০০/- হলে সুতার বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাকা : ১,৩৪,৫৬০/-;

গ. কাপড় তৈরীর মিলের সুতার ক্রয়মূল্য টাঃ ১,৩৪,৫৬০/- হলে কাপড়ের বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাঃ ১,৫৬,০৮৯/-;

ঘ. মিল হতে এজেন্ট/ডিলারের কাপড়ের ক্রয়মূল্য টাঃ ১,৫৬,০৮৯/- হলে কাপড়ের বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাঃ ১,৮১,০৬৪/-;

ঙ. এজেন্ট/ডিলারের কাছ থেকে পাইকারী বিক্রেতার কাপড়ের ক্রয়মূল্য টাঃ ১,৮১,০৬৪/- হলে তার বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টাঃ ২,১০,০৬৪/-

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, যে তুলার মূল ক্রয়মূল্য ছিল টাঃ ১,০০,০০০/- সেই তুলা হতে তৈরী কাপড় ভোক্তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছাতে সুদ বাবদেই মূল্যের সাথে অতিরিক্ত ১,১০,০৩৪/- যুক্ত হয়েছে যা ভোক্তাকেই দিতে হবে। কারণ, চূড়ান্ত বিচারে শেষ অবধি প্রকৃত ভোক্তাই মোট সুদের ভার বহন করে। এর অন্তর্নিহিত অর্থই হচ্ছে সুদ দিতে না হলে অর্থাৎ সুদ উচ্ছেদ হলে এই অতিরিক্ত বিপুল অর্থ (টাকা পিছু অতিরিক্ত ১,১০ টাকা) ভোক্তাকে দিতে হতো না।

এভাবে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রত্যেকটিতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুদ জড়িয়ে আছে। নিরূপায় ভোক্তাকে বাধ্য হয়েই সুদের জন্যে সৃষ্ট এই চড়া মূল্য দিতে হয়। কারণ সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে এছাড়া তার গত্যন্তর নেই। অথচ সুদ না থাকলে অর্থাৎ, ইসলামী অর্থনীতি চালু থাকলে এই যুল্‌ম হতে জনসাধারণ রেহাই পেত। এতে শুধু তাদের জীবন যাত্রার ব্যয়ই কম হতো না, জীবন যাপনের মান হতো আরো উন্নত।

**১৩। সুদ মজুরী বৃদ্ধির অন্যতম বড় প্রতিবন্ধক।**

সুদের হার উচ্চ থাকলে বিনিয়োগ থাকে ন্যূনতম কোঠায়। তখন শিল্প উদ্যোক্তার পক্ষে মুনাফা অর্জনই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সে সময়ে মজুরী বৃদ্ধি

মানেই লোকসানের ঝুঁকি নেওয়া। সুদী অর্থনীতিতে সুদের হার খুব কম থাকলে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বেশি হতে পারে কিন্তু পুঁজির সরবরাহ বৃদ্ধি পায় না। সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ কম হওয়ার ফলে শ্রমিকের চাহিদাও কম থাকে। অন্যদিকে চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান অনেক বেশি থাকায় শ্রমিকদের দিক থেকে মজুরী বৃদ্ধির দাবী উত্থাপন আদৌ সহজ হয় না। উপরন্তু বিদ্যমান কম মজুরীতেই চাহিদার চেয়ে শ্রমিকের যোগান বেশি হওয়ায় উদ্যোক্তারা মজুরী বৃদ্ধির দাবী সহজে মেনে নিতে চায় না। ফলে অনিবার্যভাবেই সংঘাত দেখা দেয়। শ্রমিকরা কর্মবিরতি, ঘেরাও, ধীরে চলো, ধর্মঘট, হরতাল, অবস্থান ধর্মঘট প্রভৃতি কর্মসূচীর আশ্রয় নেয়। পরিণামে মালিক পক্ষ ছাঁটাই, লেঅফ, লক আউট ইত্যাদি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে, সুদের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে বিক্রিও হ্রাস পায়। এই অবস্থায় মজুরী বৃদ্ধি পেলে মুনাফার হার হ্রাস পেয়ে সুদের হারের চেয়েও নিচে নেমে যেতে পারে। তাই মজুরী বৃদ্ধির কোন দাবীই শিল্প মালিকদের পক্ষে বিবেচনায় আনা সম্ভব হয় না।

এই কারণেই জাপানে মেইজী শাসন আমলে মজুরী বৃদ্ধির জন্যে শ্রমিকদের জোর দাবী থাকলেও যাইবাৎসু গোষ্ঠী তা মেনে নেয়নি, সরকারও এ ব্যাপারে শ্রমিকদের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। বৃটেনেও কৃষকদের স্বার্থে প্রণীত ১৮১৫ সালের শস্য আইন (Corn Law) ত্রিশ বছর পরেই বাতিল করা হয় শিল্পপতিদের স্বার্থে। শস্য আইন বহাল থাকলে গমের দাম বৃদ্ধি পেতো। এতে কৃষকেরা লাভবান হতো। কিন্তু শিল্প শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করাও অপরিহার্য হয়ে পড়তো যার ফলে অবশ্যম্ভাবীভাবে শিল্পপতিদের মুনাফা হ্রাস পেতো। ফলে তাদের স্বার্থহানি ঘটতো। তাই তারা আন্দোলন করেছিল ঐ আইন বাতিল করার জন্যে।

**১৪। সুদ দীর্ঘ মেয়াদী বৃহৎ বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে।**

সুদনির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো দীর্ঘ সময় ধরে পুঁজি আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এমন ধরনের বিনিয়োগে আদৌ উৎসাহ দেখায় না। এজন্যেই ব্যয়বহুল বড় শিল্প-কারখানা সুদী ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠতে

পারে না। এসব শিল্প-কারখানা স্থাপনে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় তা সুদের ভিত্তিতে যোগান দিলে প্রতি বছর বিপুল অংকের অর্থ সুদ হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। বড় বড় মিল-কারখানা সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে চালু হতে দুই হতে তিন বছরের gestation period প্রয়োজন হয়। এই দীর্ঘ সময়ে সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে এমন অংক দাঁড়াবে যে সে বোঝা বহন করা লাভজনক শিল্পের পক্ষেও সম্ভব নয়। আর লোকসান হলে সুদে-আসলে ঋণের যে অংক দাঁড়ায় তা পরিশোধ করা কখনো সম্ভব হয় না। স্বাভাবিকভাবেই উদ্যোক্তা তখন দেউলিয়া হতে বাধ্য হয়। একমাত্র মতলববাজ ঋণখেলাপীরাই তথ্যবিকৃতি ঘটিয়ে ব্যাংক হতে বড় আকারের বিনিয়োগ গ্রহণ করে শিল্প বা কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্যে। কারখানা গড়ে তুললেও তারা আর কখনও ঋণ পরিশোধ করে না। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। এর অশুভ প্রতিক্রিয়ার শিকার হয় দেশের অর্থনীতি।

**১৫। সুদ সঞ্চয়কে অনুৎপাদনশীল সরকারী বিনিয়োগে উৎসাহিত করে।**

সুদী অর্থনীতির ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকাররা ঝুঁকিমুক্ত, নিশ্চিত ও নির্ধারিত আয় পাওয়ার উদ্দেশ্যে জনগণের গচ্ছিত আমানতের বিরাট এক অংশ ট্রেজারী বিল ক্রয়, বিনিময় বিল ভাঙানো, সরকারী সিকিউরিটি বা ঋণপত্র ক্রয় ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। ফলে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগের জন্যে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব দেখা দেয়। পরিণামে সুদের হার বৃদ্ধি পায় এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা আরো হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়। যুগপৎ কর্মসংস্থানের সংকোচন হয় ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয় সংকটের। এই অবস্থায় শেষ পর্যন্ত সরকারকেই এগিয়ে আসতে হয় সংকট মোচনের জন্যে।

**১৬। সুদের কারণে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে।**

পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, সুদের কারণেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় অবশ্যম্ভাবীভাবে ও অপ্রতিহত গতিতে। উপরন্তু অব্যাহত মুদ্রাস্ফীতি ঘটার অন্যতম কারণও সুদ। এই দুইয়ের যোগফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস

ওঠে। নির্দিষ্ট আয়ের শ্রমজীবী, সাধারণ কৃষিজীবী, নানা ধরনের পেশাজীবী ও বেতনভুক্ত কর্মচারীরা এই সাধারণ মানুষের কাতারে শামিল। এদের আয়ের স্তর ও পরিমাণ যেহেতু মোটামুটি একটা দীর্ঘ সময় ধরে একই রকম থাকে সেহেতু দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির ফলে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে একদিকে জীবন যাপনের মানের অবনতি ঘটে, অন্যদিকে বাজারে কার্যকর চাহিদারও সংকোচন ঘটে। এরই চূড়ান্ত পরিণাম হিসেবে কলকারখানায় মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায়, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনাও রুদ্ধ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ ঠিক রাখার জন্যে পুনরায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় শিল্প-উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা। জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা তখন কমে যায় আরও এক ধাপ।

**১৭। সুদভিত্তিক ঋণে তৈরী প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সম্মুখীন হলে উদ্যোক্তা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।**

উদ্যোক্তা যতক্ষণ ব্যাংকের সুদ পরিশোধ করে ততক্ষণ ব্যাংক তার ঋণ মঞ্জুরী অব্যাহত রাখে। এমনকি ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি করে। কিন্তু যখনই কারবারে লোকসান দেখা দেয় তখন ব্যাংক নতুন অর্থলগ্নি করা দূরে থাক পূর্বের ঋণ ফেরত দেবার জন্যেই চাপ দেয়। এই অবস্থায় উদ্যোক্তা মাথায় হাত দেয়। কারণ তার নিজের পুঁজি ছিল সামান্যই, পুরো ব্যাপারটিই ছিল পরের ধনে পোদ্দারী। ফলে এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। পরিণামে গোটা কারবারটি বন্ধ বা ধ্বংস হয়ে যায়।

**১৮। সুদভিত্তিক ঋণের কারণে ব্যক্তির/প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্বের বোঝা চাপে সমগ্র জাতির ঘাড়ে।**

বাংলাদেশ এর উজ্জ্বলতম উদাহরণ। ধনী ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিরা নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদানের অঙ্গীকারে তাদের দেওয়া Collateral বা জামানতের বিপরীতে ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হতে দশগুন বা তারও বেশি পরিমাণ ঋণ পেয়ে থাকে। অর্থাৎ নিজেদের দশ লক্ষ টাকা থাকলে তারা এক কোটি টাকা ঋণ পায়। এক্ষেত্রে অনেক সময় রাজনৈতিক প্রভাব বা সম্পৃক্ততাও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোটি টাকারও বেশি এই

অর্থের ব্যবসা বা শিল্পে যে মুনাফা হয় তার সবটুকুই ভোগ করে ঐ ঋণগ্রহণকারী উদ্যোক্তা। ব্যাংকে অর্থ আমানতকারীরা সুদ পেলেও মুনাফার কোন অংশই তারা পায় না। অথচ লোকসানের কারণে ঐ প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হলে তার দায়ভার চাপে গোটা জাতির উপর। জনগণের সঞ্চয় তখন আর ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার দৃশ্যমান লোকসান ঐ দশ লক্ষ টাকা হলেও (যদিও পূর্বের মুনাফা সে পুরোটা একাই ভোগ করেছে) জনসাধারণের লোকসান অনেক ক্ষেত্রে পুরো কোটি টাকাই। কষ্ট করে এই টাকা যারা সঞ্চয় করে ব্যাংকে আমানত রেখেছিল তাদেরই এখন ফতুর হবার পালা।

বাংলাদেশের ঋণ খেলাপী শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রি করে দিলেও ব্যাংক হতে তাদের গৃহীত ঋণ শোধ হবার নয়। কারণ এর পেছনে অদৃশ্য হাতের কারসাজি কাজ করেছিল। রাজনৈতিক মদদে ঋণ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সদস্যরাই নামে-বেনামে ঋণ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশের কোন তোয়াক্কা না করেই। অনেক ক্ষেত্রে মুনাফার যথাযথ প্রকল্প সমীক্ষাও করা হয়নি। শুধুমাত্র সুদের হিসাব কষেই কল্পিত মুনাফার লোভনীয় টোপ দিয়ে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা যা আর কোন দিনই ব্যাংকে ফিরে আসবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলো সরকারী তহবিলের মদদ পেলেও বেসরকারী ব্যাংকগুলো এই দায় উদ্ধারের জন্যে কার মদদ পাবে?

### ১৯। সুদ অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতার মুখ্য কারণ।

একথা সর্বজনবিদিত যে পুঁজি বাজারে মূলধনের চাহিদা হ্রাস পেলে সুদের হার হ্রাস পায়, আবার মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সুদের হারও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের সুদের হারের ওঠানামাকালীন সারির তথ্য (Time series data) বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কোন দেশে সুদের হার দীর্ঘকাল স্থিতিশীল থাকতে পারে না। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোন কারণে তেজীভাব শুরু হলে মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পুঁজির যোগান দার তখন সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে পুঁজির চাহিদা হ্রাস পেতে শুরু করে,

এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তা পূর্বের চেয়েও হ্রাস পায়। এর মুকাবিলায় সুদের হার আবারও হ্রাস করা হয়। পুনরায় মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সুদের হার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এভাবে সুদের হারের ঘন ঘন ওঠানামার কারণে বিনিয়োগকারীরা নিক্ষিপ্ত হয় অনিশ্চয়তার মধ্যে। এরই ফলে বিনিয়োগ, শেয়ার, পণ্য ও মুদ্রা বাজারে দারুণ অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হয় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রীডম্যান বলেছেন, সুদের হারের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত ওঠানামার ফলে যে কোন দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক অস্থিরতার সৃষ্টি হতে পারে।

**২০। সুদের দীর্ঘমেয়াদী কুফলস্বরূপ অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয়।**

সুদভিত্তিক বিনিয়োগ ও ব্যবসার কারণে অর্থনীতিতে বারবার মন্দা ও তেজীভাবের আবর্তন হতে থাকে। এর ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সব সময় অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। যে কোন অর্থনীতির জন্যে এ অবস্থা অনাকাঙ্খিত। অর্থনীতিতে যখন তেজীভাব থাকে তখন সুদের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে সুদের হার যখন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তখন ঋণ গ্রহীতারা হিসাব করে যদি দেখে যে অতিরিক্ত সুদের হারের কারণে লাভের সম্ভাবনা খুব কম তখন তারা ঋণ নেওয়া বন্ধ করে দেয়। তখন পুঁজি বিনিয়োগে ভাটা পড়ে, উৎপাদন কমে যায়, শ্রমিক ছাঁটাই হয়, ব্যবসায়ে সৃষ্টি হয় মন্দা। এভাবে পুঁজির চাহিদা খুব কমে গেলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আশায় ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে দেয়। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা নতুন করে ঋণ নিয়ে তখন উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দেয়। ক্রমে মন্দা কেটে গিয়ে পুনরায় তেজীভাবের সৃষ্টি হয়। এভাবে বারবার মন্দা ও তেজী অবস্থার সৃষ্টি অর্থনীতির জন্যে যে অত্যন্ত অশুভ ও ভয়াবহ পরিণতির জন্ম দেয় সে বিষয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তারাও একমত।

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সুদ আসলেই অর্থনীতির জন্যে অপরিহার্য নয়, সঞ্চয়ের জন্যে তো নয়ই। বরং তা অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। সুদনির্ভর

পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম পুরোধা বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ লর্ড জন মেনার্ড কেইন্‌স তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ The General Theory of Employment Interest and Money-তে প্রমাণ করেছেন সঞ্চয়ে সুদের কোন ভূমিকা নেই। সুদ বিদ্যমান না থাকলেও লোকে ব্যক্তিগত কারণেই অর্থ সঞ্চয় করবে। দুর্দিনের খরচ ও আকস্মিক বড় ধরনের ব্যয় মেটাবার প্রয়োজনেই তারা সঞ্চয় করে।

## ২১। সুদ ধন বন্টনে অসমতার অন্যতম কারণ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক।

কেইন্‌স দেখিয়েছেন সুদের জন্যেই বরং বিনিয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে। যে কোন দেশের অর্থনীতির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সুদের উচ্চ হারের সময়ে বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াস সংকুচিত হয়েছে। অপরদিকে সুদের হার যখন ন্যূনতম তখনই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াসও বেড়ে গেছে। কেইনসের মতে সুদের হার যখন শূন্য তখনই পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জনের লক্ষ্য পূরণ হয়। বাংলাদেশের শিল্পকারখানার সাম্প্রতিক অবস্থার প্রতি নজর দিলে এই সত্য সহজেই অনুধাবনযোগ্য। দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং রপ্তানী আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস গার্মেন্টস ও নীটওয়্যার শিল্পের কারখানা মালিকেরা সমস্বরে দাবী তুলেছে বিদ্যমান সুদের হার হ্রাস করার জন্যে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বর্তমান সুদের হার ১৬%-১৮% হতে হ্রাস করে ন্যূনতম ৫% বা তার নিচে নামিয়ে আনা না হলে তাদের লোকসান দিতে হবে, এমনকি কারখানা বন্ধ করে দিতে হতে পারে। অন্যান্য শিল্প-কারখানা মালিকেরাও অনুরূপ দাবী তুলেছে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক বাধ্য হয়েই বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বর্তমান সুদের হারকে যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনতে দিকনির্দেশনা দিয়েছে। (দ্রষ্টব্য : দৈনিক সংগ্রাম, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৮)। কারণ শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে শুধু বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনই বন্ধ হবে না, লক্ষ লক্ষ শ্রমিকও বেকার হবে, সরকার হারাবে বিপুল রাজস্ব। সমগ্র অর্থনীতিতে যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে

অনিবার্যভাবেই। একইসঙ্গে ব্যাংকেও অলস টাকার পাহাড় জমবে। তাছাড়া ধনবণ্টন, বিশেষতঃ মুনাফা ও মজুরীর ক্ষেত্রে সুদের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে এবং বিত্তশালীদেরই সুদের ভিত্তিতে বৃহৎ আকারের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগের ফলে অনিবার্যভাবেই ধনবণ্টনে অসমতা সৃষ্টি হয়। বলাবাহুল্য, সুদ শুধু অর্থনৈতিক সাম্যেরই বিরোধী নয়, সামাজিক সম্প্রীতিরও বিরোধী।

**২২। সুদ মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যক্ষ ইন্ধন যোগায়।**

অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ সুদ। সুদনির্ভর অর্থনীতিতে সুদের কারণে দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি যুক্ত হলে দ্রব্যমূল্য হয় আরও ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পায় না। ফলে জীবন যাত্রা হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। সুদনির্ভর অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আমানতের বিপরীতে বহুগুণিতক ঋণ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান অধিক হারে উপার্জনের আশায় অর্থাৎ সুদ প্রাপ্তির জন্যে বিপুল পরিমাণে কাগুজে আমানতসৃষ্ট ঋণ দেয়। এক্ষেত্রে বাস্তবে অর্থ না থাকলেও ঋণ গ্রহীতার ক্রয়ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায় যার প্রতিফলন ঘটে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্যের ক্ষেত্রে। পরিণামে অবধারিতভাবেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

উপরন্তু সুদী ব্যাংক গ্যারান্টির ভিত্তিতে অনেক অনুৎপাদনশীল ঋণ, ভোগ্যঋণ ও সরকারের বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্যে ঋণ দিয়ে থাকে। এসব ঋণের সঙ্গে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির কোনই সংগতি থাকে না। অর্থাৎ বাজারে অর্থের সরবরাহ বাড়ে কিন্তু তার বিপরীতে পণ্যসামগ্রী ও সেবার যোগান বাড়ে না। ফলশ্রুতিতে অনিবার্যভাবেই সৃষ্টি হয় মুদ্রাস্ফীতির যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে কোন পদক্ষেপই ফলপ্রসূ বা কার্যকর বিবেচিত হয় না। অথচ এই সময়ে ব্যবসায়ীরা বর্ধিত মূল্যে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা লুটে নেয়। ব্যাংকের পক্ষেও বেশি পরিমাণে সুদ আদায়ের সুবিধা হয়। কিন্তু জনগণের, বিশেষতঃ সীমিত আয়ের লোকদের দুর্দশার সীমা-পরিসীমা থাকে না। তাদের জীবন যাপনের মানের অধোগতি হতে শুরু করে যা রোধ করা

সহজে সম্ভব হয় না। শেষ অবধি জনতার অব্যাহত জোর দাবীর মুখে সরকার যখন সচেতন হয় কিছু একটা করার জন্যে ততদিনে সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়ে যায়।

**২৩। সুদ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প স্বনির্ভর হওয়ার প্রধান প্রতিবন্ধক।**

দারিদ্র্য বিমোচন তথা আত্মকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্যে বর্তমানে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান বা মাইক্রো ক্রেডিটের ব্যবহার ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এই উদ্যোগ প্রকৃত লক্ষ্য হাসিলে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ প্রায়শঃই প্রান্তিক। সেই প্রান্তিক মুনাফাও শূন্য বা ঋণাত্মক হয়ে দাঁড়ায় সুদ পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতার ফলে। আত্মকর্মসংস্থানমূলক ক্ষুদ্র প্রকল্পের জন্যে ঋণ নিয়ে সুদসহ মূলধন পরিশোধ করার সময়ে দেখা যায় কঠোর শ্রমের দ্বারা উপার্জিত বর্ধিত আয়ের প্রায় সবটুকুই তুলে দিতে হচ্ছে ঋণদাতা এনজিওর মাঠকর্মীদের হাতে। ফলে ঋণগ্রহীতার হাতে মুনাফা হিসেবে প্রায় কিছুই থাকছে না। অর্থাৎ, লাভের গুড় পিঁপড়ায় খেয়ে নিচ্ছে। এজন্যেই উদ্যোক্তার নিজের পুঁজি গড়ে উঠে না। নিজ হতেই উদ্যোগ গ্রহণ তার পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় প্রায় অসম্ভব। নিজের পুঁজি গড়ে না উঠলে মূলধনের জন্যে পরনির্ভরশীলতা থেকেই যায়। তাকে পুঁজিপতির বা অর্থলগ্নিকারীর শরণাপন্ন হতেই হয়। এই সুযোগেরই অপেক্ষায় থাকে ক্ষুদ্র ঋণদাতারা তথা এনজিওগুলো। এরা কখনই আন্ত রিকভাবে চায় না ঋণগ্রহীতারা প্রকৃতই স্বনির্ভর হয়ে উঠুক। তাহলে সুদ উপার্জনের উর্বর ক্ষেত্রগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। এজন্যেই এরা লাভ-লোকসানের অংশীদারিভিত্তিক বিনিয়োগ নয়, সুদভিত্তিক ঋণ দিতেই অধিক আগ্রহী। বস্তুতঃ দারিদ্র্য বিমোচন নয়, এরা প্রকারান্তরে দারিদ্র্যের চাষ করছে।

## গ. রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কুফল

**২৪। সুদ বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ায়।**

উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রায়শঃ শিল্প ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণের জন্য বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ঐ সব ঋণ নির্দিষ্ট

মেয়াদ শেষে সুদসহ পরিশোধযোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রায়ই দেখা যায় ঐসব ঋণ না নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়া যায়, না উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে কাঙ্খিত উন্নতি অর্জন করা যায়। ফলে ঋণ পরিশোধ তো দূরের কথা, অনেক সময় শুধু সুদ শোধ দেওয়াই দায় হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় পূর্বের ঋণ পরিশোধের জন্য এসব দেশ আবার নতুন করে ঋণ গ্রহণ করে। এই নতুন ঋণ সুদে-আসলে পূর্বের ঋণকে ছাড়িয়ে যায় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সুদ-আসলে সমুদয় ঋণই বোঝা হয়ে চাপে জনগণের কাঁধে।

অনুরূপভাবে দেশে কোন বিপর্যয় বা সংকট দেখা দিলে অথবা খাদ্য শস্যের মতো অপরিহার্য পণ্যের ঘাটতি ঘটলে তা পূরণের জন্যে সরকারকে বন্ধু দেশ বা ঋণদানকারী কনসর্টিয়াম থেকে ঋণ নিতে হয়। ভোগের জন্যে গৃহীত এই ঋণের বিপরীতে যেহেতু কোন উৎপাদন বা কর্মসংস্থান হয় না, সেহেতু এই ঋণের আসল পরিশোধ তো দূরের কথা, যথাসময়ে সুদই পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে সরকারকে হয় বাড়তি কর আরোপ করে এই অর্থ জনগণের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হয়, নয়ত আবারও ঋণ নিতে হয়।

### ২৫। সুদের কারণেই ধনী ও দরিদ্র দেশের প্রকৃত সম্পর্ক হয় শোষক-শোষিতের।

বর্তমান বিশ্বের দেশগুলোকে প্রধানতঃ দুটি অভিধায় বিভক্ত করা হয়ে থাকে– ধনী ও দরিদ্র, খুব সম্মান রেখে বললে উন্নত ও উন্নয়নশীল। দরিদ্র দেশগুলো সকলেই প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র নয়। তাদের রয়েছে পর্যাপ্ত মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু এই দুই সম্পদ কাজে লাগাবার জন্যে তাদের যেমন নেই আধুনিক প্রযুক্তি তেমনি নেই পর্যাপ্ত অর্থ। এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চেষ্টা করে ধনী দেশগুলো। পৃথকভাবে কোন একটি দেশ নয়, বরং ইউরোপের ধনী দেশগুলোর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ার ধনী দেশগুলোর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক জোটবদ্ধভাবে প্রাকৃতিক সম্পদশালী কিন্তু আপাততঃ দরিদ্র দেশগুলোকে তাদের হাতের মুঠোয় রাখতে বদ্ধপরিকর। সেজন্যে এদের কৌশলের অন্ত

নেই। এদের প্রধান কাজ হলো বিশেষজ্ঞ পরামর্শের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশাল বিশাল প্রকল্প তৈরী ও গ্রহণ করিয়ে আর্থিক সহযোগিতার নামে চড়া সুদে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণে প্ররোচিত করা এবং দীর্ঘমেয়াদে শোষণ করা। ছলে-বলে-কৌশলে তারা এই কাজটা অব্যাহতভাবে করে চলেছে।

একবার ঋণের ফাঁদ এসব দেশের গলায় পরাতে পারলে তাদের মতলব হাসিল হয়ে যায়। তখন যেমন রাজনৈতিকভাবে এদেরকে চাপে রাখা যায় তেমনি অর্থনৈতিকভাবে এসব দেশকে শোষণের পথও সুগম হয়ে যায়। এই শোষণ যেমন দীর্ঘমেয়াদী তেমনি এর প্রকৃতিও ভয়াবহ। শুধু গৃহীত ঋণের সুদ বাবদ তখন প্রতি বছর হাজার কোটি টাকার উপর পরিশোধ করতে হয়। বাংলাদেশ গত ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে সুদ বাবদই পরিশোধ করেছে ১৭ কোটি ৬২ লক্ষ মার্কিন ডলার বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১২২৫ কোটি টাকা। (সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৭; পৃ. ২৫৬, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)। ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট দেশের গুরুত্বপূর্ণ সব প্রতিষ্ঠান যেমন রাজনৈতিক দল, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, সংবাদপত্র, পার্লামেন্ট এমনকি ধর্মচর্চার কেন্দ্রগুলোও ক্রমেই ঋণদাতা দেশগুলোর কর্তৃত্বের আওতায় চলে আসে। পুঁজিপতিরা যেভাবে চায় সে ধরনের সরকারই এসব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সরকারের যাবতীয় পলিসিও তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে এরাই কৌশলপত্র তৈরীর নির্দেশ দেয় এবং সেই কৌশলপত্রও (Poverty Reduction Strategy Paper বা PRSP) এদের তত্ত্বাবধানেই তৈরী হয় যার গূঢ় উদ্দেশ্য দারিদ্র্য বিমোচন নয় বরং দারিদ্র্যের প্রসার, তৃণমূল পর্যায়ের মানুষদের আরও বেশি পরমুখাপেক্ষী করে তোলার।

উন্নত ধনী দেশগুলোর সাথে দরিদ্র দেশগুলোর বৈষম্য যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ সুদী ঋণ ব্যবস্থা। সুদভিত্তিক বৈদেশিক ঋণ দুনিয়ার দরিদ্র দেশগুলোর জন্যে অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নত দেশগুলোর সুদভিত্তিক ঋণ আজ আন্তর্জাতিক শোষণের মুখ্য হাতিয়ার

যা সাম্রাজ্যবাদেরই আরেক নতুন রূপ। এরই কারণে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতু মাত্রা যোগ হয়েছে। এ সম্পর্ক এখন কার্যতঃ শোষক ও শোষিতের।

## পরিত্রাণের উপায়

সুদের এই সর্বগ্রাসী সয়লাব, এর ভয়াবহ বিধ্বংসী কুফলসমূহ হতে উদ্ধার লাভের উপায় কি? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী খিলাফাতের দীর্ঘ নয়শত বছরে মুসলিম বিশ্বের কোথাও সুদ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু মুসলিমদের পতন দশা শুরু হলে যখন পাশ্চাত্যের ধনবাদী আগ্রাসী শক্তিসমূহ একে একে মুসলিম দেশগুলো গ্রাস করতে শুরু করে তখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় চরম নাজুক অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূ-সম্পত্তি সবই চলে যায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দখলে। এই সময়েই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদের বিস্তার শুরু হয়। দীর্ঘদিন পরে যখন এসব দেশ পুনরায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে ততদিনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদ গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। উপরন্তু পতাকা বদল হলেও সাম্রাজ্যবাদী ইসলামবিরোধী শক্তির রেখে যাওয়া মতাদর্শের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তাই সুদ উচ্ছেদের জন্যে এসব দেশে মাত্র বিগত শতাব্দীর শেষভাগে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে ইসলামী পদ্ধতির ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা চলেছে। কিন্তু এরপরও বাংলাদেশের মতো বহু মুসলিম দেশে অর্থনৈতিক-সামাজিক-প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে সুদ সদাপটে বিরাজমান। কিভাবে একে সমাজদেহ হতে উচ্ছেদ করা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে কিভাবে চিরতরে দূর করা যায়, এক কথায় সুদ বর্জনের কৌশল কি হতে পারে তারই কিছু কর্মসূচি এখানে আলোচিত হলো।

### (ক) সামাজিক কর্মসূচি

**১। গণসচেতনতা সৃষ্টি।**

সুদ বর্জনের তথা সমাজ হতে সুদ উচ্ছেদের জন্যে গণসচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নেই। এ দেশের জনগণের প্রায় ৮৫% লোক মুসলিম। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) জন্যে জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু যথার্থ ইসলামী

জ্ঞানের অভাবে সুদ যে ইসলামে সর্বৈব হারাম সে সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞাত নয়। আধুনিক শিক্ষিতদের কেউ কেউ এমনও বলেন, ঐ নির্দেশ চৌদ্দশত বছর আগে ঠিক ছিলো, এখন নয়। নাউযুবিল্লাহ। তাদের যুক্তি, ব্যাংকের প্রাপ্য সুদ ও ব্যক্তির দাবিকৃত সুদ একই পর্যায়ের বিবেচিত হতে পারে না। কারণ রাসূলের (সা) যুগে ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়নি। আবার একদল বলেন, আরবী রিবা এবং ইংরেজী Interest একই অর্থ বহন করে না। অথচ আভিধানিক ও ব্যবহারিক বিচারে রিবার অর্থ এবং ইংরেজী Interest-এর ব্যবহারিক অর্থ একই দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "ব্যবসাকে হালাল করা হলো আর সুদকে করা হলো হারাম" (সূরা আল বাকারা : ২৭৫ আয়াত)। দেশের সাধারণ জনগণের বিপুল অংশ প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের এই নির্দেশ সম্বন্ধে অবগত নয়। এজন্যেই তাদের কাছে এই কুরআনী নির্দেশ যথাযথ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা অতীব প্রয়োজন।

সুদের ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে প্রথমেই যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা দরকার তা হলো সুদের আয় যেমন হারাম, সুদের সঙ্গে যে কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতাও তেমনি হারাম এবং হারাম সূত্রে উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। এই আলোচনার শুরুতে রাসূলুল্লাহর (সা) এক হাদীস হতে সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে যে যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লেখে এবং সুদের সাক্ষ্য দেয় সকলের উপরও আল্লাহর অভিসম্পাত।

সহীহ হাদীস অনুসারে আল্লাহর কাছে দু'আ কবুল হওয়ার জন্যে যে শর্তগুলো রয়েছে, তার অন্যতম হলো হালাল রিযকের উপর বহাল থাকা (সহীহ মুসলিম)। সুতরাং, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে যদি আমাদের উপার্জনই হালাল না হয় তাহলে আল্লাহর দরবারে যতই ফরিয়াদ করি না কেন তা কবুল হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে আমাদের সকল ইবাদাত বন্দেগীই বরবাদ হয়ে যাবে। এর চূড়ান্ত পরিণতি হলো আখিরাতে আল্লাহর আযাব হতে রেহাই না পাওয়া। এ থেকেই হালাল রুযীর অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। বস্তুতঃ হালাল অর্জন ও হারাম বর্জনের মধ্যেই রয়েছে মুমিনের জীবনের যথার্থ সাফল্য। এই সাফল্য অর্জনের জন্যে চাই নিরন্তর নিরলস প্রয়াস।

ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবল সুদ উচ্ছেদের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। জনগণের চাহিদা এবং তার দৃঢ় বহিঃপ্রকাশ ছাড়া সরকার নিজ থেকে খুব কমই তাদের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকে। তাই সুদ উচ্ছেদের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার বিপরীত। এজন্যে সবার আগে চাই গণসচেতনতা। আমাদের দেশের জনগণের একটা অংশ এখনও শিক্ষিত নয়। তাই কাজটা একটু কঠিন ও আয়াসসাধ্য তবে অসম্ভব নয়। কারণ এদেশের জনগণ ধর্মভীরু। তাদেরকে যদি যথাযথভাবে ইসলামের দাবি কী এবং তা অর্জনের উপায় কী এটা বুঝানো যায়, প্রকৃতই উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে এদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামো হতে সুদ বর্জন সময়সাপেক্ষ হতে পারে কিন্তু অসম্ভব নয়। এজন্যে নিচে উল্লেখিত উপায়গুলো অনুসরণ করা যেতে পারে।

**প্রথমতঃ** মসজিদে জুম'আর খুতবার সাহায্য গ্রহণ।

বছরে বায়ান্ন দিন এলাকার জনগণ মসজিদে জুম'আর নামাযে শামিল হন। এই নামাযের খুতবায় নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সেসব বিষয়ের পাশাপাশি যদি খতিব বা ইমাম সাহেব সুদী অর্থনীতির কুফল এবং দেশ ও জাতির জন্যে সুদ কতখানি ক্ষতিকর তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলেন তাহলে ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

**দ্বিতীয়তঃ** ওয়াজ মাহফিল ও ইসলামী জলসায় আলোচনা।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিল, তাফসীর মাহফিল ও ইসলামী জলসায় উলামায়ে কিরাম ও মুফাস্‌সিরে কুরআনগণ বক্তৃতা করে থাকেন। সেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। ঐসব অনুষ্ঠানে যদি ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণময় দিক এবং সুদী অর্থনীতির কুফল সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝিয়ে বক্তব্য রাখা যায় তাহলে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, জনমত গড়ে উঠবে তার ধাক্কাতেই সুদী অর্থনীতি উৎখাত হতে পারে, বাস্তবায়িত হতে পারে ইসলামী অর্থনীতি।

**তৃতীয়তঃ** দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং।

সুদের অপকার সম্বন্ধে আমজনতাকে ওয়াকিফহাল তথা সচেতন করে

তুলতে হলে দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং একটা মোক্ষম উপায়। এর মাধ্যমে সহজেই সুদের ভয়াবহ কুফল ও হালাল রুযীর অপরিহার্যতা সম্বন্ধে মোটা দাগে প্রয়োজনীয় কথাগুলো সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা যায়। সুন্দর ডিজাইনে বড় বড় অক্ষরে ছাপা পোস্টার জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। একইভাবে দেওয়াল লিখনের চমৎকার শ্লোগানগুলো দাগ কেটে বসবে লোকের মনে। পৃথিবীর সকল দেশেই বিশেষতঃ উন্নয়নশীল দেশসমূহে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠিগুলো ছাড়াও খোদ সরকারই এই পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছে। ফলও পাচ্ছে হাতে হাতে।

**চতুর্থতঃ** রেডিও এবং টিভিতে কথিকা, আলোচনা অনুষ্ঠান ও টক শো'র ব্যবস্থা গ্রহণ।

বর্তমানে টেলিভিশনের প্রভাব বিপুল হলেও রেডিওর কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা শেষ হয়ে যায়নি। সুদের শোষণ ও নানাবিধ কুফল সম্পর্কে আলোচনা প্রচারিত হতে পারে রেডিও এবং টিভি থেকে। বাংলাদেশে এখন অনেক বেসরকারী টিভি চ্যানেল রয়েছে। ইসলামী আদর্শ অনুসারী অনেক প্রোগ্রামও প্রচারিত হয় এসব গণমাধ্যম হতে। সেসব প্রোগ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় এ ধরনের অনুষ্ঠান। এর মাধ্যমে অগণিত দর্শক-শ্রোতার কাছে উপভোগ্যভাবে হারাম উপার্জন ও তার ভয়াবহ পরিণামের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। সুদের অপকার সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা হতে পারে। টক শো'র মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রাঞ্জলভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করলে অজস্র মানুষ এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে, উপকৃত হতে পারে। তাদের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হবে। পরিণামে সুদ পরিত্যাগের জন্যে তাদের অনেকেই যে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নেবে নিঃসন্দেহে সে আশা করা যায়।

**পঞ্চমতঃ** পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশ।

দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় সুদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিকতা বিধ্বংসী প্রসঙ্গসমূহ নিয়ে পরিকল্পিতভাবে নিয়মিত বিশদ আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকলে তা যেমন গণসচেতনতা সৃষ্টি করবে তেমনি

গণজাগরণেরও আবহ তৈরী হবে। একই উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে, দেশের কর্ণধারদের সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে উপসম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হতে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে দৈনিক ইত্তেফাকের রাজনৈতিক মঞ্চ এই ধরনের ভূমিকাই রেখেছিল। দেশে এখন ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সেসব দৈনিক এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসলে তা হবে প্রশংসনীয় এক বিরাট খিদমত।

**২। আখিরাতে জবাবদিহিতার চেতনা সৃষ্টি।**

মুসলিম জীবনের রয়েছে দুটি পর্ব- ইহকাল ও পরকাল বা আখিরাত। পরকালের জীবনটাই অনন্ত, ইহকালের জীবন ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর। পরকালের জীবনে রয়েছে অপরিমেয় পুরস্কার অথবা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ নির্দেশিত পথে ইহকালে জীবনযাপন করলে যেমন আখিরাতে রয়েছে আনন্দময় জীবন তেমনি সেই নির্দেশের পরিপন্থি জীবন যাপনের জন্যে রয়েছে অনন্ত দুঃখভোগ। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, জাহান্নামে অনন্তকাল সেই দুঃখভোগ চলতে থাকবে এবং জাহান্নাম নিঃসন্দেহে নিকৃষ্টতম স্থান। এই দুনিয়া পরকালের জন্যে কর্ষণক্ষেত্র স্বরূপ। তাই এখানে যেমন কাজ করা হবে তারই ফল লাভ ঘটবে আখিরাতে। যেসব কারণে আখিরাতে বনি আদমকে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে তার অন্যতম হলো হারাম পন্থায় উপার্জন ও হারাম বস্তু ভোগ।

রাসূল (সা) বলেছেন, হারাম খাদ্য হতে শরীরে যে রক্তমাংস সৃষ্টি হয় তা জাহান্নামের আগুনের খোরাক হবে। হারাম খাদ্য শুধু হারাম বস্তু হতেই তৈরী হয়না, হারাম উপার্জন হতে সংগৃহীত খাদ্যও হারাম বলেই গণ্য হবে। সুদ-ঘুষ, চুরি-দুর্নীতি-টেণ্ডারবাজি-জালিয়াতি, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, নকল করা, জুয়া, ফটকাবাজি, প্রতারণা প্রভৃতি সবই ইসলামে হারাম। এসব হারাম পন্থায় উপার্জন করা বা বিত্তবান হওয়া যেমন হারাম তেমনি ঐ উপার্জন বা বিত্ত-সম্পদ ভোগ বা ব্যবহার করাও হারাম। পূর্বেই বলা হয়েছে, হালাল রুযী দু'আ কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত।

সুতরাং, বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হারাম উপার্জন আখিরাতে আমাদের কোন কাজে তো আসবেই না, উল্টো এর পরিণাম ফল হবে ভয়াবহ। এজন্যেই অন্যান্য সব হারাম উপার্জনের মতো সুদও অবশ্যই বর্জন করতে হবে। সুদ খাওয়ার পাশাপাশি সুদের হিসাব লিখে ও সাক্ষ্য দিয়েও উপার্জন করা সম্ভব। এই পথও বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ, কোনো প্রকারেই সুদের সাথে কোনো সংস্রব রাখা চলবে না। তা না হলে এই আয়ের জন্যে, এই আয়ে জীবন ধারণের জন্যে আখিরাতে ভয়াবহ ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। জনগণের মধ্যে এই চেতনা, এই বোধ জাগিয়ে তোলা অতীব জরুরী।

এ দেশের আমজনতার মধ্যে ইসলামপ্রীতি ঈর্ষণীয়। কিন্তু এদের বিপুল অংশ ইসলামের মূল দাবি *'আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার'*-এর অনুসরণের মাধ্যমেই যে আল্লাহর ইবাদাত বা তার বন্দেগী হয়, সে সম্বন্ধে প্রায় অনবহিত বললে অত্যুক্তি হবেনা। এমন অজস্র লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যারা সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। অর্থাৎ, তাদের বিশ্বাস শুধু এগুলো পালন করলেই একজন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে মুসলিম হিসেবে স্বীকৃত হবে এবং আখিরাতে নাজাত পেয়ে যাবে। আয়-রোজগার, ব্যয়, ভোগ, বিনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কী সে সম্বন্ধে না তারা জানার চেষ্টা করেছে, না সেসব আমলের ব্যাপারে সতর্ক হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করাই হলো অত্যাবশ্যক কাজ।

হালাল রুযী উপার্জনের ব্যাপারে, হালাল আহার ও হালাল সামগ্রী ভোগের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, এমনকি মাযহাবী ইমামগণ কতদূর সতর্ক ছিলেন সে খবর আমরা কতজন রাখি? অথচ সেসব উদাহরণ হওয়া উচিৎ ছিলো আমাদের পালনীয় আদর্শ। বহু লোক আখিরাতকে ভয় করলেও আখিরাতের জবাবদিহিতা সম্পর্কে হয় অনবহিত, নয়তো গাফিল বা অসতর্ক। বর্তমানের প্রয়োজনের অজুহাতে অথবা শয়তানের কৌশলী প্রতারণা বা প্ররোচনায় বশীভূত হয়ে তারা দুনিয়া তথা এর সম্পদ ও ভোগবিলাস অর্জনের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করছে।

ফলে হালাল-হারামের বাছ-বিচার তাদের কাছে গৌণ বা তাচ্ছিল্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভ্রান্তি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, অনেকে সুদের কারবার করে, সুদের লেনদেন করে, সুদী উপার্জনের অর্থেই এই উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে যায় যে হজ্জের কারণে আল্লাহ তাআলা তার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দেবেন। অথচ সহীহ হাদীসের মর্মার্থ এর বিপরীতটাই।

**৩। পাঠ্যসূচিতে ইসলামী অর্থনীতি চালু করা।**

বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু জনগণের তথা মুসলিম জনগোষ্ঠির সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে স্কুল-কলেজের শিক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের ঈমান ও আকীদার কোনো সংশ্রব নেই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষার কথা বাদ দিলে উচ্চমাধ্যমিক ও সম্মান শ্রেণীসহ উচ্চতর শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষা কোনো পর্যায়েই ইসলাম যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তা জানার ও অনুশীলনের কোনোও সুযোগ নেই। এই অবস্থার নিরসন হওয়া দরকার। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠির ঈমান ও আকীদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন গোটা পাঠ্যসূচির সংস্কার। যারা আগামী দিনে এদেশের প্রশাসন বিচার আইন ব্যবসা-বাণিজ্য ও কল-কারখানার কর্ণধার হবে তাদের যদি এখনই সুদী অর্থনীতির কুফল ও ধ্বংসাত্মক দিক সম্বন্ধে অবহিত করা না যায় এবং পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতির গঠনমূলক ও হিতকর দিকগুলো জানানো না যায় তাহলে জাতি যে তিমিরে রয়েছে সেই তিমিরেই রয়ে যাবে।

কিশোর বয়সেই যা শেখা যায়, যে বিষয়গুলো স্কুলের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে সারা জীবন তার প্রভাব রয়ে যায় মানুষের চিন্তা, চেতনা ও কর্মধারার উপর কখনো সচেতনভাবে কখনো অবচেতন মনে। সেজন্যেই বিভিন্ন মতাদর্শের স্কুলের পাঠ্যসূচির বিষয়সমূহ নির্বাচন করা হয় যথেষ্ট সতর্কতার সাথে, প্রচুর যাচাই-বাছাই ও চিন্তা-ভাবনার পর। জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য, মানবিক মূল্যবোধ, কল্যাণময় জীবন, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ সমাজ গঠনের জন্যে যেসব মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য সেসব বিষয়ই ঐসব স্কুলের

পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর স্কুলের পাঠ্যসূচি বা যেসব সিলেবাস অনুসরণ করা হয় সেগুলো একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই সত্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। আমাদের দেশেও বিগত দশক গুলোতে স্কুলের পাঠ্যসূচির পরিবর্তন লক্ষণীয়। দেশের মুক্তি সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী, বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনগাঁথা ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা বাধ্যতামূলকভাবে ঠাঁই পেয়েছে স্কুলের পাঠ্যসূচিতে।

অথচ গভীর পরিতাপের বিষয়, ইসলামী জীবনাদর্শ, আচরণ, ইসলামী শিক্ষা, অমর মুসলিম মনীষীদের জীবন কাহিনী এই পাঠ্যসূচিতে গুরুত্বের সাথে ঠাঁই করে নিতে পারেনি। ফলে লক্ষ লক্ষ শিশু ও কিশোর-কিশোরীর ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট হয়ে গড়ে ওঠার কোনো সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিকড়হীন জনসমর্থনহীন বাকসর্বস্ব মুষ্টিমেয় এসব বুদ্ধিজীবির সুকৌশলী পদক্ষেপ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে যেন কোনোক্রমেই ইসলামী জীবনাচরণ সম্পর্কে জানার ও শেখার সুযোগ না থাকে সেজন্যে এরা প্রায়শঃই সেক্যুলার পাঠ্যসূচির যৌক্তিকতা, বিজ্ঞানমনস্ক পাঠ্যসূচির অপরিহার্যতা ইত্যাকার চটকদার ব্যানারে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-ওয়ার্কশপের আয়োজন করে গৃহীত সুপারিশসমূহ জাতীয় দাবি শিরোনামে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে পেশ করে। একই সঙ্গে তাদের ঘরানার পত্রিকাগুলোও এর পক্ষে জোর সমর্থন দিয়ে যায়। ফলে সরকারের নীতি নির্ধারকরাও বিভ্রান্ত বা বিচলিত না হয়ে পারেনা। অথচ দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠির ঈমান ও আকীদার সাথে সম্পর্কিত বিষয় স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ ছিলো। ইসলামী জীবনাচরণ, হালাল উপার্জনের অপরিহার্যতা, যাকাতের সামাজিক-অর্থনৈতিক সুফল, সুদের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিকর প্রসঙ্গ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা খুবই জরুরী।

**৪। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ।**

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সাহিত্য ব্যক্তি মানসে, চিন্তা-চেতনায় গভীর প্রভাব ফেলে। ব্যক্তি মানুষের মানসিক গঠন ও অনুভূতির বিকাশে কবিতা, গল্প,

উপন্যাস ও রম্যরচনার প্রভাব অনস্বীকার্য। তাই সুদের বিরুদ্ধে গণমানুষকে উজ্জীবিত করতে হলে, বিশেষতঃ শিক্ষিত জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে সাহিত্যের এসব রূপকে ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন বয়সের উপযোগী করে কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও রম্যরচনা লেখা ও প্রকাশেরও উদ্যোগ নিতে হবে ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়নে আগ্রহী গোষ্ঠি ও সংগঠনগুলোকে। এ উদ্যোগে শামিল করতে হবে ইসলামপ্রিয় শক্তিমান কবি-সাহিত্যিকদেরকে। ছড়া ও লিমেরিক এক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাছাড়া ইতিমধ্যেই বাংলা সাহিত্যে কুসীদজীবি ও দাদন ব্যবসায়ীদের নিয়ে যেসব গল্প প্রকাশিত হয়েছে সেসবেরও একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশিত হতে পারে।

অনুরূপভাবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারী ফিল্মও তৈরী করা প্রয়োজন। সুদী এনজিওদের নিগ্রহের সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরী হতে পারে ডকুমেন্টারী ফিল্ম। এগুলোর সিডিও তৈরী করা যায় এবং সেগুলো দেশব্যাপী ছড়িয়েও দেওয়া যায়। সুদের নানাবিধ কুফলের নির্বাচিত দিক নিয়ে তৈরী করা যেতে পারে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। এগুলো বিভিন্ন টিভি চ্যানেলেও প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া যায়। চলচ্চিত্র যেহেতু একইসঙ্গে অডিও এবং ভিডিও মাধ্যম তাই এর প্রভাব হবে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। শহর ও গ্রামীণ জনপদে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপর এসব চলচ্চিত্রের ইতিবাচক প্রভাব যে ব্যাপক সাড়া ফেলবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে সুদ বর্জন ও উচ্ছেদের কর্মসূচি যুগপৎ বেগবান হবে ও সামাজিক আন্দোলন হিসেবে ব্যাপ্তি লাভ করবে।

### ৫। সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি।

সুদের মতো ভয়াবহ এক অক্টোপাসের নাগপাশ হতে মুক্তি লাভ করতে প্রয়োজন মজবুত সামাজিক প্রতিরোধ। যথাযথ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে বহু অন্যায়-অপকর্ম ও অসামাজিক কাজ হতে জনগণকে বিরত রাখা যায়। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে, সামাজিকভাবে সচেতন করতে পারলে বহু কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। এদেশে বনায়ন কর্মসূচি

তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। বছর ত্রিশেক পূর্বে দেশের অনেক এলাকায় মরুকরণের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। সে সময়ে বৃক্ষরোপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে জনমত তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়। রেডিও-টেলিভিশন-সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমে নানা অনুষ্ঠান প্রচার ছাড়াও স্কুল-কলেজ-মক্তব্য-মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এই কাজে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গৃহীত হয়। একাজের সামাজিক স্বীকৃতিস্বরূপ শহর, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। আজ তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

সুদ উচ্ছেদের জন্যে এ ধরনের জনমত গঠনের পদক্ষেপ নিতে হবে। এক সময়ে এদেশের সমাজে সুদবিরোধী মনোভাব বিদ্যমান ছিলও। কিন্তু আজ সমাজে সুদখোরদের দাপট চোখে পড়ার মতো। গ্রামাঞ্চলে সুদখোর তথা মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীরা সমাজপতিদের মধ্যেও আসন করে নিয়েছে। শহরেও সুদের লেনদেনকারী ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিরা সকল কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। সুদকে আজ আর ঘৃণার চোখে দেখা হচ্ছে না। সুতরাং, এখনই এর প্রতিবিধানের চেষ্টা না করলে এই সর্বনাশা পাপ ও সমাজ বিধ্বংসী বিষ আরও ভয়াবহ রূপ নেবে। এজন্যেই প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি। এই প্রতিরোধ যতই ব্যাপক ও দুর্বার হবে সুদের নিষ্পেষণ ততই আলগা হতে বাধ্য। ক্রমে এক সময়ে তা খসে পড়বে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা গেল।

ক. সুদখোরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ।

সমাজে যারা সুদখোর বলে পরিচিত, তাদের পরিচিতি যাই হোক না কেন ধীরে ধীরে তাদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে। তারা যেনো বুঝতে পারে যে সুদের সঙ্গে সংশ্রব থাকার কারণেই জনগণ তাদের সঙ্গ বর্জন করছে বা তাদের এড়িয়ে যাচ্ছে। কাজটা কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু সকলে মিলে এগিয়ে এলে মোটেই দুঃসাধ্য নয়।

খ. সুদখোরদের জনপ্রতিনিধি না বানানো।

জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কোনো কাজে সুদখোরদের নির্বাচিত হতে দেওয়া হবেনা। ভোটপ্রার্থী হলে যেনো ভোট না দেওয়া হয় সেজন্যে জোর প্রচারণা

চালাতে হবে। জনগণকে বুঝাতে হবে এসব লোকের কার্যক্রমের জন্যেই সমাজে শোষণ নির্যাতন নিপীড়ন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে।

গ. সুদখোরদের সামাজিকভাবে বয়কট করা।

বাংলাদেশেই আজ হতে পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে গ্রামাঞ্চলে সুদখোরের দাওয়াত কেউ সহজে গ্রহণ করতে চাইতো না। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির দাপটে এবং দীনি শিক্ষা বঞ্চিত হওয়ার কারণে সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

ঘ. সরকার যেসব ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সুদ প্রদান বাধ্যতামূলক করে রেখেছে সেগুলো রহিত করার জন্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা।

উদাহরণতঃ জমির খাজনা যথাসময়ে দিতে না পারলে তার উপর সুদ দিতে হয়। সুদের বদলে সরকার জরিমানা আরোপ করতে পারে। ঈমান ও আকীদা বিরোধী সুদ কেনো দিতে হবে? অনতিবিলম্বে সরকার যেনো খাজনার খাত থেকে সুদ প্রত্যাহার করে নিতান্তই অপরিহার্য ক্ষেত্রে জরিমানার ব্যবস্থার চালু করে সেই লক্ষ্যে জনমত গঠন করা প্রয়োজন।

উপরে উল্লেখিত কাজগুলো নিঃসন্দেহে কঠিন। কিন্তু মুমিনের জীবনে কোন্ কাজটি সহজ? বরং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের উপর তাওয়াক্কুল করে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সমবেতভাবে এসব উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে।

**৬। অনাবশ্যক সামাজিক ব্যয় প্রতিরোধ।**

সমাজে বসবাস করতে হলে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন যোগ দিতে হয় তেমনি আয়োজনও করতে হয়। কিন্তু বিপত্তি বাধে যখন ঐসব অনুষ্ঠান আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু অনেক অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে প্রচলিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ঐসব অনুষ্ঠানের কোনো ধর্মীয় ভিত্তিই নেই। যেমন কেউ মারা গেলে মৃত্যুর পর চল্লিশ দিনের মাথায় ধুমধাম করে দশ গ্রামের বা মহল্লার লোকজন ডেকে খানাপিনার আয়োজন করা। ছেলের খাৎনা উপলক্ষে বন্ধু-বান্ধব, পড়শী-স্বজন সকলকে ডেকে

উৎসবমুখর পরিবেশ ও ভোজের আয়োজন এবং অভ্যাগতদেরকে উপঢৌকন প্রদানে বাধ্য করা। এছাড়া রয়েছে জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী, বিবাহ-বার্ষিকী প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান। এরপর আসে বিয়ে-শাদীর কথা। ইসলামের এই অপরিহার্য ও সরল সামাজিক অনুষ্ঠানটিতে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণে ঢুকে পড়েছে পান-চিনি বা পাকাদেখা, গায়ে হলুদ, বিয়ের তত্ত্ব পাঠানো এবং অতি অবশ্যই ঘৃণ্য যৌতুক প্রথা। সম্প্রতি যৌতুকবিরোধী মনোভাব দানা বেঁধে ওঠার প্রেক্ষিতে একে গিফট বা উপঢৌকনের লেবাস পরানো হয়েছে।

একজন বিত্তশালী ব্যক্তি অক্লেশে এসব অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। অনেক ক্ষেত্রে নতুন বিত্তশালী বা হঠাৎ করে ধনী হওয়া লোকেরা সামাজিক পরিচিতি, প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভের জন্যে তাদের অর্জিত নতুন বিত্ত খরচ করেন অকাতরে। সমস্যার সৃষ্টি হয় যখন একই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে বলা হয় মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কাউকে। সমাজপতিরা রায় দেন– এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, এটা দিতে হবে, না হলে সমাজচ্যুত হতে হবে। অথচ এসবের ব্যয়ভার বহনের সাধ্য তার নেই। নিরূপায় হয়ে তখন তাকে সহায়-সম্বল বিক্রি করতে হয় অথবা ঋণ নিতে হয় সুদ দেবার শর্তে। সাধারণতঃ এসব সামাজিক প্রয়োজনে ঋণের সুদের হার বেশ চড়া হয়ে থাকে। কারণ, ঋণদাতা ভাল করেই জানে যে ঋণ গ্রহীতার বিকল্প কোনো উপায় নেই। সামাজিক অনুষ্ঠানসম্পন্ন করার জন্যে বাধ্য হয়ে নেওয়া এই ঋণ অতি অবশ্যই অনুৎপাদনশীল। ফলে তা পরিশোধ করা হয়ে দাঁড়ায় আরও দুরূহ। তাই ঋণের বোঝা চেপে বসে গ্রহীতার মাথায় জগদ্দল পাথরের মতো। শেষ অবধি তাকে শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু, এমনকি ভিটেমাটি পর্যন্ত বিক্রি দিতে হয় ঋণ পরিশোধের জন্যে। এই পথে গ্রাম বাংলার হাজার হাজার মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীন চাষীতে পরিণত হয়েছে। চাকুরীজীবিদের অনেকের ক্ষেত্রে এই ব্যয় পুষিয়ে নেবার অন্যতম উপায় ঘুষ যার বোঝা বইতে হয় পরোক্ষভাবে সমাজের সকলকেই। এর প্রতিবিধান ও প্রতিরোধের জন্যে চাই গণসচেতনতা।

## (খ) অর্থনৈতিক কর্মসূচি

### ৭। শারীয়াহভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের প্রসার।

আধুনিক সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চাঙ্গা রাখতে হলে ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্যতার কথা গুরুত্বের সাথেই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু প্রচলিত সব প্রতিষ্ঠানই সুদনির্ভর বিধায় শারীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক। এরই প্রতিবিধানের জন্যে গত তিন দশক ধরে মুসলিম বিশ্বে গড়ে উঠেছে ইসলামী শারীয়াহভিত্তিক ব্যাংক, বীমা ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান। আনন্দের কথা, প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই এসব প্রতিষ্ঠান ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং একই সঙ্গে সাফল্য অর্জনেও সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু দেশের সর্বত্র এসব প্রতিষ্ঠানের শাখা তথা কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়তে পারেনি এখনও। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের যেমন রয়েছে নিজস্ব সীমাবদ্ধতা, তেমনি রয়েছে নানা আইনী প্রতিবন্ধকতা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দেশে ক্রমবিকাশমান ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যে আজ অবধি কোনো বিধিবদ্ধ আইন প্রণীত হয়নি। গভীর পরিতাপের বিষয়, এদেশে সাংবিধানিকভাবেই ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হলেও এ বিষয়ে কোনো সরকারই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। বরং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান নতুনভাবে স্থাপনের ক্ষেত্রে নিরন্তর বিধি-নিষেধ ও নানা পরোক্ষ বাধার বেড়াজাল আরোপিত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফ হতেই। এদেশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ঈর্ষণীয় সাফল্যে প্রভাবিত হয়ে কয়েকটি সুদী ব্যাংকের ইসলামীকরণ ঘটেছে। গত শতাব্দীর শেষপাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কয়েকটি ইসলামী বীমা ও ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন। কিন্তু এরপরই নতুনভাবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এই শর্ত শিথিল করলে জনগণ ইসলামী পদ্ধতিতেই বীমা পলিসি গ্রহণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ পাবে। ফলে ক্রমশঃ সুদের বাজার ও দাপট সংকুচিত হয়ে আসবে। সুদ উচ্ছেদের জন্যেই দেশে আরও ইসলামী

পদ্ধতির ব্যাংক, বীমা ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন এবং একই সাথে সেসবের সেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্মকৌশল উদ্ভাবিত ও বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক।

**৮। করযে হাসানা ও মুদারাবা পদ্ধতির বাস্তবায়ন।**

সমাজে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি এবং বিত্তহীন দক্ষ ও যোগ্য লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে করযে হাসানা ও মুদারাবা পদ্ধতি। ইসলামী অর্থনীতির এই অপরিহার্য বিধান দুটি এদেশে অনুপস্থিত। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, এমনকি সংখ্যালঘু মুসলিম দেশ শ্রীলংকাতেও মসজিদভিত্তিক করযে হাসানা ও সোসাইটি ভিত্তিক মুদারাবা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এদেশেও এই ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। সমাজের বিত্তশালী লোকদের করযে হাসানা দেওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই উদ্যোগ যদি মসজিদকেন্দ্রিক হয় তাহলে সত্যিকার যোগ্য লোককে যেমন সুযোগ দেওয়া যাবে তেমনি এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের পাশাপাশি সমাজ সচেতনতা ও সমাজকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

মুদারাবা পদ্ধতি এদেশে চালু করতে সময়ের প্রয়োজন। কারণ এজন্যে প্রয়োজন হবে আইন কাঠামো বদলানোর পাশাপাশি উত্তম চরিত্রের লোক সৃষ্টির। উত্তম ও যোগ্য লোকেরা মুদারাবার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি– উভয়বিধ উপায়েই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে। উপরন্তু সমাজের বিত্তশালী লোকদের মনোভাব পরিবর্তনের জন্যে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন তাদের ইসলামী অনুশাসন জানতে ও অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করণ। এর ফলে দুঃসময়ে প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়া সহজ হবে বিনা সুদেই এবং বিনিয়োগ গ্রহীতা সুদ প্রদানের বাড়তি দায় হতে রক্ষা পাবে। করযে হাসানা দিলে সেই অর্থের জন্যে আয়কর দিতে হবেনা এবং মুদারাবার ক্ষেত্রে সাহিব আল-মালকে কেবল মুনাফার নির্দিষ্ট পরিমাণের উর্ধ্বের অর্থের জন্য আয়কর দিতে হবে এমন আইন করে বিত্তশালী মুসলিমদের মনোযোগ এক্ষেত্রে আকর্ষণ করা সম্ভব।

## ৯। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের উপযুক্ত কৌশল উদ্ভাবন।

দরিদ্র অথচ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের জন্যে পুঁজির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সেই পুঁজির পরিমাণও যে খুব বেশি এমন নয়। কিন্তু তাই-ই তাদের কাছে সহজলভ্য নয়। এই প্রয়োজন পূরণের জন্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণের প্রসার ঘটেছে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট-বড় জাতীয়-আঞ্চলিক মিলিয়ে পাঁচ শতাধিক এনজিও এই কাজে অংশগ্রহণ করে চলেছে। কিন্তু দরিদ্র জনগণ, বিশেষতঃ মহিলারা যারা ক্ষুদ্র ঋণের সর্ববৃহৎ ক্লায়েন্ট তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কি সত্যি সত্যি ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে? দু-চারটি সম্মানজনক ব্যতিক্রমী ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে দেখানো যায়, কিন্তু সেসবের ভিত্তিতে সরলীকরণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলে বিপত্তি ঘটে। ঋণ ও সুদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নির্দিষ্ট হারে সুদসহ কিস্তি প্রদানের শর্তেই এনজিওরা ঋণ দিয়ে থাকে। পুঁজি পাওয়ার কোনো সহজ উপায় না থাকায় নিরূপায় হয়েই দরিদ্র মহিলা ও পুরুষরা ঋণ নেয়। এই ঋণের সুদের হার বেশ চড়া।

দেশের কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পি,এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্যে পরিচালিত ও সম্প্রতি সমাপ্ত কয়েকটি মাঠ গবেষণার তথ্য হতে দেখা গেছে, এনজিওদের প্রদত্ত ঋণ ব্যবহার করে গ্রামীণ মহিলাদের দারিদ্র্য যেটুকু হ্রাস পেয়েছে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। তাদের স্বনির্ভরতা অর্জন বা নীট দারিদ্র্য হ্রাস ঘটেনি। এর প্রধান কারণ, প্রাপ্ত ঋণ কাজে লাগিয়ে ঋণগ্রহীতারা যা উপার্জন করে তার বৃহৎ অংশই চলে যায় সুদসহ কিস্তি শোধ করতে। ফলে তাদের হাতে উদ্বৃত্ত থাকে যৎসামান্যই। তাদেরকে অপেক্ষায় থাকতে হয় পুনরায় ঋণ পাবার জন্যে। পুনরায় ঋণ না পেলে তাদের কর্মসংস্থানের উপায়টিও রুদ্ধ হয়ে যায়। এছাড়া সুদসহ মূলধনের কিস্তি শোধ করতে গিয়ে বহু সময়েই দারুণ বিড়ম্বনাময় পরিস্থিতির শিকার হতে হয় ঋণগ্রহীতাকে। সুদভিত্তিক এনজিওর মাঠকর্মীরা খাতকের ঘরের চালের টিন খুলে নিয়েছে, শেষ সম্বল দুধের গরু ধরে নিয়ে গেছে, এমনকি ন্যূনতম ভব্যতার মুখোশ

ছুঁড়ে ফেলে সধবার নাকফুল পর্যন্ত খুলে দিতে বাধ্য করেছে কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্যে এমন খবর হরহামেশাই প্রকাশিত হচ্ছে দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে। কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে এমন উদাহরণও অপ্রতুল নয়। সুদখোর মহাজনরাও কম যায় না। এরাও এত নিষ্ঠুর পাষণ্ড যে দেনার দায়ে গৃহস্থের ঘরের চালের টিন খুলে নিয়েছে, এমনকি শেষ পর্যন্ত ঘরের খুঁটি উপড়ে নিয়ে গেছে যার সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিকে। (দ্রষ্টব্য : দৈনিক প্রথম আলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)

প্রসঙ্গতঃ জানা দরকার মাইক্রো ক্রেডিট ও মাইক্রো ফাইন্যান্স সমার্থক নয়। ফাইন্যান্সের সাথে মুনাফার প্রসঙ্গ যুক্ত থাকলে তা হয়ে দাঁড়ায় বিনিয়োগ বা ইনভেস্টমেন্ট। পক্ষান্তরে ফাইন্যান্সের সাথে সুদযুক্ত হলে তা হয়ে ওঠে ঋণ বা ক্রেডিট। এই ঋণ বা ক্রেডিট নিয়ে বেকার নারী-পুরুষ সাময়িকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিতে পারে বটে কিন্তু তার আয়ের সিংহভাগই চলে যায় কিস্তিতে সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে। পরিণামে স্বাবলম্বী হতে পারা তার জন্য দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যেই বিশ্বজুড়ে মাইক্রো ক্রেডিটের এত বন্দনা চললেও এর দ্বারা স্থায়ীভাবে স্বাবলম্বী মানুষের সংখ্যা বাড়েনি, প্রকৃত দারিদ্র্য দূর হয়নি। বরং অনেকেরই মতে এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্যকে জিইয়ে রাখা হচ্ছে। কারো কারো অভিমত, মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে এনজিওগুলো আসলে দারিদ্র্যের চাষ করছে।

এই অবস্থা হতে পরিত্রাণের জন্য বিকল্প হিসেবে ইসলামী এনজিও গঠন এবং তৃণমূল পর্যায়ে তার বিস্তৃতি সাধন এখন সময়ের দাবি। এখন উদ্যোগ নিতে হবে ঋণ নয়, বিনিয়োগ প্রদানের জন্যে। এই উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণমূলক বিনিয়োগ স্কীম বা Participatory Investment Scheme চালু করা বাঞ্ছনীয়। এটি মুদারাবা পদ্ধতিরই একটি রূপ। এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হতে অর্জিত মুনাফার একটা অংশ পাবে সংশ্লিষ্ট এনজিও, বাকিটা পাবে উদ্যোক্তা। লাভ যদি না হয় তাহলে উদ্যোক্তাকে কোনো বাড়তি বোঝা বইতে হবে না। যেহেতু এক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধের শর্ত

নেই সেহেতু লাভ না হলেও বাধ্যতামূলকভাবে সুদ প্রদানের দায়িত্বও নেই। কাজেই কষ্টার্জিত উপার্জনের সিংহভাগ তুলে দিতে হবে না এনজিওদের হাতে। প্রকৃত অর্থে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রহীতারাই উপকৃত হবে এই পদ্ধতিতে। পাইলট স্কীম হিসেবে হলেও এই পদ্ধতি চালু করা সময়ের দাবি। তৃণমূল পর্যায় হতে সুদ উচ্ছেদের জন্যে এটি কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

**১০। যাকাতভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ।**

সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি তথা জীবনের সকল ক্ষেত্র হতে সুদ নির্মূল করতে হলে যাকাতভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইসলামের অন্যতম মুখ্য কৌশল। এই কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের যেমন বিকল্প নেই তেমনি এর সাথে আপোষও হতে পারে না। মুসলিম সমাজে যেদিন হতে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও তার যথাযথ ব্যবহার বন্ধ হয়েছে সেদিন হতেই দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা তথা যুল্‌ম চেপে বসেছে। বিশেষতঃ যেসব কারণে লোকেরা সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয় সেসবের মূলোচ্ছেদ করতে হলে যাকাতের জুড়ি নেই। যাকাতের অর্থ গ্রহীতার হাতে পৌঁছে দেওয়া হয় বা তার জন্যে ব্যয় করা হয় কোনো প্রত্যুপকার বা আর্থিক প্রত্যাশা না করেই। তাই এক্ষেত্রে লাভের গুড় পিঁপড়ের খাওয়ার কোনো আশংকা নেই।

যাকাতের অর্থ উৎপাদনী ও অনুৎপাদনী উভয় ধরনের প্রয়োজন পূরণে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর এবং আকস্মিক বিপদগ্রস্ত লোকের প্রয়োজনের প্রধান ও বৃহৎ অংশটিই অনুৎপাদনী শ্রেণীর। মুখ্যতঃ এই প্রয়োজন পূরণের জন্যেই তারা মহাজনের শরণাপন্ন হয় এবং গৃহীত অর্থের জন্যে সুদ প্রদানে বাধ্য থাকে। অথচ যাকাতের অর্থের জন্য– তা অনুৎপাদনী বা উৎপাদনী যে কাজেই ব্যবহার করা হোক না কেন– সুদ তো দিতে হবেই না, মুনাফা হলেও তারও অংশ বিশেষ কাউকে দিতে হবে না। যাকাতভিত্তিক মূলধন, ফেরত দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাই এই অর্থ ব্যবহার করে যথার্থ স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা যতটা সহজ মাইক্রো ক্রেডিটের দ্বারা তা আশা করা যায় না।

উল্লেখ্য, সমাজের যে বিপুল সংখ্যক লোক কর্মজীবি হলে দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতিধারা সচল হয়, কেইনসের ভাষায় পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌছানো যায় সেই স্তরে পৌছুতে হলে প্রয়োজন একটা Big Push বা প্রবল ধাক্কা। এজন্যে যুগপৎ প্রয়োজন বিপুল অর্থের ও দক্ষ উদ্যোক্তার। উদ্যোক্তা উন্নয়ন তথা ভিখারীর হাতকে কর্মীর হাতিয়ারে রূপান্তরের মধ্য দিয়েই দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম। এজন্যে প্রয়োজন মানবসম্পদ উন্নয়ন। দারিদ্র্য বিমোচনের পদক্ষেপের পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গৃহীত না হলে সমাজে স্থায়ী কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন অসম্ভব। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে রূপান্তর তথা মানবসম্পদে উন্নীত করার জন্যে অন্ন-বস্ত্র ছাড়াও যেসব মৌলিক প্রয়োজন পূরণ খুবই জরুরী সেসবের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা এবং গৃহায়ন। সুদনির্ভর ঋণভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পূরণ হবার নয়। অথচ পরিকল্পিতভাবে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করে এই লক্ষ্য অর্জন খুবই সম্ভব।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী লোকের সংখ্যা ২০০৫-এ বৃদ্ধি পেয়ে ৫ কোটি ৬০ লক্ষে দাঁড়িয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৭, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০০৭; পৃ. ১৪৮)। এদের অবস্থার উন্নয়নের জন্যে সরকার গ্রহণ করেছেন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের (Poverty Reduction Strategy Paper বা PRSP) আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরীর কর্মসূচি। দুঃখের বিষয়, এজন্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এর চাইতে বহু গুণ অর্থ আদায় হতে পারে যাকাত সূত্রেই যদি সরকার এজন্যে প্রয়োজনীয় আইন বা বিধি প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং কৃষিবিভাগের ফসল উৎপাদনের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আমাদের মতো দেশেও যাকাত ও উশর সূত্রে বার্ষিক চার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ আদায় হওয়া খুবই সম্ভব। উপরন্তু PRSP-এর আওতায় সরকারের

গৃহীত কর্মসূচির ক্ষেত্রে বেশ কিছু জরুরী পদক্ষেপ বাদ পড়েছে যেগুলো গ্রামীণ জনগণ ছাড়াও শহর ও শহরতলীর জনগণের জন্যেও সমানভাবে প্রয়োজন। এসবের মধ্যে রয়েছে সহায় সম্বলহীন বিধবা এবং বিকলাঙ্গদের জন্যে জীবন ধারণ উপযোগী মাসোহারা, কন্যাদায়গ্রস্তদের কন্যার বিবাহে আর্থিক সহযোগিতা, প্রসবকালীন অত্যাবশ্যক প্রয়োজন পূরণ, দরিদ্র শিশুদের পুষ্টি যোগান, ঋণগ্রস্ত কৃষকদের জমি অবমুক্তকরণ, মরণোত্তর ঋণ পরিশোধ, দরিদ্র পরিবারের জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ, স্বল্পব্যয়ে বাসগৃহ নির্মাণ এবং নদীভাঙ্গন ও অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন।তাছাড়া প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মহীন সময়ে যাকাতের অর্থ হতে পরিকল্পিতভাবে সহায়তা প্রদান করলে সুদভিত্তিক ঋণের চাহিদা দূর হবে।

**১১। আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয় পরিহার।**

বিলাসিতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তার পথ ধরে ব্যক্তির বা পরিবারের অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। এক সময়ে নিয়মিত উপার্জনে ব্যয় সংকুলান না হলে ঋণের আশ্রয় নিতে হয়। এই মোক্ষম সুযোগে সুদ অনুপ্রবেশ করে সংসারে। সাধ্যের বাইরে যেয়ে বিলাসবহুল বাড়ি বানাতে হলে, ফ্যাশানেবল গাড়ি কিনতে হলে, কেতাদুরস্ত লাইফস্টাইল অনুসরণ করতে হলে ঋণ না করে উপায় নেই। একটি বাড়ি থাকতে পুনরায় সুদে ঋণ নিয়ে আরেকটি বাড়ি তৈরী কিংবা সম্পদ মর্টগেজ রেখে ঋণ করে বাড়ি কেনাকে অনেক সাচ্চা মুসলিমও গুনাহর কাজ করে মনে করেন না। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঋণ ও সুদ অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত। তাই ঋণ পেতে হলে সুদ দেবার অঙ্গীকার করতেই হবে। উপরন্তু বর্তমান সময়ে বিভিন্ন বিপণী বিতান হতে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে যেসব আসবাবপত্র ও ইলেকট্রিক-ইলেকট্রনিক দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি হয় সেসবেও যুক্ত রয়েছে সুদ। তাই ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন হতে সুদ উচ্ছেদ করতে হলে অতি অবশ্যই বিলাসিতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, অন্যের অন্ধ অনুকরণ এবং আড়ম্বরপ্রিয়তা পরিহার করা যৌক্তিক দাবি।

## উপসংহার

আশা করা যায়, উপরে আলোচিত উপায়সমূহ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এদেশে সুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হবে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ঘোষিত হারাম বর্জনের জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস সূচিত হবে। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন-মানসিকতা প্রবলভাবে ইসলামমুখী। পক্ষান্তরে বিদ্যমান আইন-কাঠামো, সামাজিক আচরণ, এমনকি ব্যবসায়ীদের অধিকাংশেরই চিন্তা-চেতনা ইসলামী ঈমান-আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে সমাজে বিরাজমান রয়েছে এক বিষম অবস্থা।

আজও পুঁজিবাদী পদ্ধতি ও রোমান-বৃটিশ আইন দ্বারা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রিত। এই প্রতিকূল অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখেই বলা যায়, সুদ বর্জন ও উচ্ছেদের জন্যে যেমন একদিকে চাই ঈমানের জোর ও সুদের নানামুখী ধ্বংসাত্মক কুফল সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান, অন্যদিকে তেমনি চাই সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। সুদ উচ্ছেদ ও বর্জনের কৌশল হিসেবে যেসব উপায় সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোই শেষ কথা নয়, আরও কার্যকর পথ বা কৌশল উদ্ভাবিত হতে পারে। কিন্তু কাগজের পাতাতেই এসব কৌশল আবদ্ধ থাকলে কোনো সুফল আসবে না। বরং বাস্তবায়নযোগ্য একটি এ্যাকশন প্লান রচনা করে সেই অনুযায়ী ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে এগিয়ে গেলে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তিরও আশা করা যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফাতের সময় মুসলিম বিশ্বের কোথাও সুদ চালু ছিলো না। সেই সময়েও মুসলিম ব্যবসায়ীরা বিশাল মাপের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করেছে। সুদূর চীনের জিনজিয়াং এলাকা হতে স্পেনের আন্দালুসিয়া, কর্ডোভা কিংবা আফ্রিকার জাঞ্জিবার পর্যন্ত বাণিজ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করেছে, পণ্যদ্রব্যের পসরা নিয়ে বসেছে নগরে-বন্দরে। কিভাবে সে সময়ে তাদের মূলধনের প্রয়োজন পূরণ হতো? কিভাবে তারা শারীয়ার শর্ত পালন করে ব্যবসায়িক লেনদেন করতো?

এর উত্তর হলো সেই সময়ে তারা মুদারাবা, মুশারাকা, বায়ই সালাম, বায়ই মুয়াজ্জাল, মুরাবাহা, ইস্‌তিসনা, কেরায়া, জু'আলাহ, ইজারা, ইজারা বিল বায়ই, শিরকাতুল মিলক্ ইত্যাদি দশ/বারোটি পদ্ধতি ব্যবহার করতো। ফলে তাদের কখনই সুদের ভিত্তিতে অর্থ লেনদেনের প্রয়োজন হয়নি। আধুনিককালে দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকগুলো এসব পদ্ধতিই ব্যবহার করে চলেছে তাদের আমানত বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে। একাজে ইতিমধ্যেই তাদের অর্জিত সফলতা রীতিমতো ঈর্ষণীয়।

তাই অর্থনীতি সুদবিহীন হলে বিনিয়োগের জন্যে যেমন অর্থের অব্যাহত চাহিদা থাকবে, তেমনি সঞ্চয়েরও সদ্ব্যবহার হবে। এর ফলে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসাণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সম্পদের সুষম বণ্টন ঘটবে। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে একচেটিয়া কারবার হ্রাস পাবে। অতি মুনাফার সুযোগ ও সমাজ স্বার্থবিরোধী বিনিয়োগ বন্ধ হবে। এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন ও বড় ধরনের শোষণের পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যেই ইসলাম সুদকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেছে। বস্তুতঃ যুল্‌ম ও বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হলে তার উৎসকেই সমূলে বিনাশ করতে হবে। সেটাই বৈজ্ঞানিক পন্থা। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব। তবে সেজন্যে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। নিতে হবে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। এই উদ্দেশ্যে দেশের ইসলামপ্রিয় জনগণ, বিশেষতঃ যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে দৃঢ় ঈমানী চেতনায় বলীয়ান হয়ে। এক অর্থে সুদ উচ্ছেদ একটি জিহাদ। এই জিহাদে সফলতা বা বিজয় অর্জনের জন্যে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। তবেই সুদের ভয়াবহ যুল্‌ম থেকে মানবতা মুক্তি পাবে। হালাল রিযক প্রাপ্তির মাধ্যমে দু'আ কবুলের বদৌলতে আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমা লাভের সুযোগ হবে। একই সাথে ইহলৌকিক কল্যাণের পাশাপাশি পারলৌকিক সাফল্যও নিশ্চিত হবে। মুমিন মুসলিমের ঐকান্তিক কামনাও তাই।

– ০ –

# বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
# ঢাকা